হে বিহংগ মোর

নরেন্দ্র দে

দি বুক হাউস
১৫ নং, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

—নয় সিকা—

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ—১৩৫৩

প্রকাশক—দেবকিশোর সেন

দি বুক হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—চণ্ডীচরণ সেন, পি. বি. প্রেস ১৮নং মারকুইস স্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

আমার মা-মণিকে

এই লেখকের

আধুনিক সোভিয়েট গল্প

রবির আলোর দেশে

সুপ্রভা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জানলার গরাদ ধরে। জগদীশবাবুর মৃত্যু-সংবাদ এইমাত্র এলো।

বাইরের আকাশে তখন অন্ধকারের ভিড় জমেছিল, পৃথিবী যেন সন্ধ্যার নেশায় ঝিমুচ্ছে। জগদীশবাবুর মৃত্যুর খবর সুপ্রভাকে স্তব্ধ করে দিল।

কিছুদিন ধরেই তাঁর শরীরের অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। বার্ধক্যে বন্দীজীবন সহ্য হলো না। জেলেই তাঁর মৃত্যু হলো।

ভারতবর্ষের আত্মা অধীর হয়ে উঠেছে। আসমুদ্র হিমাচল একটী লোকের পানে তাকিয়ে আছে। শৃঙ্খল ছেঁড়ার দিন এসেছে। লক্ষ পরাণ শংকা জানে না, মৃত্যুর পরোয়া করে না এমন এক দিন।

জগদীশবাবু গম্ভীর হয়ে আছেন। অসহযোগ শুরু হয়ে গিয়েছে। ইস্কুলে গিয়ে গম্ভীরভাবে পড়িয়ে আসেন। ক্লাশ না থাকলে চুপ করে গুম্ হয়ে বসে থাকেন। কারুর সংগে কথা কন না, কি যে গভীর চিন্তা করেন, মাঝে মাঝে চোখ দুটো জ্বলে ওঠে।

সুপ্রভাও ভয় পেয়ে যায় দেখে। হলো কি তাঁর ?

একদিন গভীর রাতে তাঁকে একা টর্চ নিয়ে উঠে দরজার দিকে এগোতে দেখে সুপ্রভার কৌতূহলের সীমা ছিল না। শুতে আসার সময় সে লক্ষ্য করেছিল জগদীশবাবু মনে মনে কি এক মতলব আঁটছেন। ঘুম আসে নি তার। অন্ধকারে নির্বাক হয়ে শুয়ে ছিল সে। জগদীশবাবুকে উঠে যেতে দেখে সেও উঠে পড়লো নিঃশব্দে। উঠানের পাশে চুপটী করে দাঁড়িয়ে রইলো। টর্চের আলো ফেলে উঠান পেরিয়ে জগদীশবাবু দরজার কাছে চলে এলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন অধীর আগ্রহে—কার যেন প্রতীক্ষা করছেন। অল্প পরেই দরজায় আওয়াজ হলোঃ ঠুক ঠুক। জগদীশবাবু নিঃসাড়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অন্ধকারেই আগন্তুককে ভিতরে টেনে নিলেন। বাতি জ্বালালেন না। পল্লীগ্রামের গভীর রাত্রির মৃত্যু-তমসায় চুপি চুপি আশ্রয়দানের ব্যাপারটা কেউ লক্ষ্য করলো কি না জগদীশবাবু তা জানতেও পারলেন না।

সুপ্রভা সামনে আসতেই দেবু জড়সড় হয়ে উঠলো। কতকটা আশংকা ও সংকোচে। জগদীশবাবু বল্লেন, উনি আমার স্ত্রী। সুপ্রভার দিকে চেয়ে বল্লেন, দেবুর কথা কিছুদিন আগে বলেছিলাম না ? এই সেই দেবু। নিয়ে এলাম ওকে। কদিন আর না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটাবে ?

পলাতক রাজবন্দী দেবু। জগদীশবাবুর ছাত্র ছিল এক সময়।

দুদিন পরেই দেবু ধরা পড়লো জগদীশবাবুর বাড়ীতেই। সে সময় তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। কাঁকনতলার সরু রাস্তা দিয়ে আসছিলেন। আর ফিরলেন না। সেখান থেকে তিনিও গ্রেফ্‌তার হলেন।

সেদিনও এমনি স্তব্ধ হয়েছিল সুপ্রভা।

জানলা দিয়ে সরু মাটির পথ দেখা যায়। সূর্যের আলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো। কালো কালো অন্ধকারে গাছ-পাতার শূন্যতা ভরে এলো। সুপ্রভার মনে হতে লাগলো ওই কালো অন্ধকারটা এগিয়ে এসে তাকেও যেন গ্রাস করবে

ওই তমসার হাত থেকে এ পৃথিবীর কারুরই যেন নিস্তার নেই, কেউ পালাতে পারবে না ফাঁকি দিয়ে।

কোলকাতা থেকে এলো রমা—ছোট বোন। এলেন মিষ্টার মজুমদার ও পুত্রেরা।

রমা বল্লে, সুধীনের এবার লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা করা দরকার দিদি।

তোরা করে দে, সুপ্রভা বল্ল।

তাহলে ওকে নিয়ে যাই কোলকাতায়, রমা বল্লে, তোমার যদি অমত না থাকে।

সুপ্রভা অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কোলকাতায় নিয়ে যাবি? এখানেও তো ভালো ইস্কুল রয়েছে।

মিষ্টার মজুমদার জানালেন, কোলকাতায় গেলে আপনার ছেলের ঢের ভালো লেখাপড়া হবে দিদি। তাছাড়া, আমার ইচ্ছা নয় যে সুধী এখানে মানুষ হোক।

কেন? সুপ্রভা আহত স্বরে প্রশ্ন করলো।

মজুমদার জবাব দিলেন, বিপ্লবীর আড্ডা এখানে। স্বদেশী ব্যাপারের জন্যে কাঁকনতলার নাম বরাবর বিখ্যাত হয়ে আছে। এখানকার প্রতিটি লোকই পলিটিক্যাল সাসপেক্ট। সুধীনের উন্নতি চান তো এখান থেকে চলে আসুন দিদি। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি।

আমার শ্বশুরের ভিটে। আমি কেমন করে যাই রমা, সুপ্রভা নতমুখে বল্ল, সুধীর শিক্ষায় কোনো বাধাই দেবো না আমি। সে যাক তোদের কাছে, আমি এখানে থাকবো। আমি চলে গেলে এই ঘর দোর কিছু থাকবে? সন্ধ্যেবেলায় একটি প্রদীপও জ্বলবে না। ভিটের অকল্যাণ হবে যে।

সুধীন চলে এলো কোলকাতায়। মাসীর বাড়ী থেকে সে পড়বে। কাঁকনতলার

হাওয়ায় স্বাদেশীকতার বিষ, ও থেকে ওকে মুক্ত করতেই হবে। জগদীশবাবুর কীর্তি মিষ্টার মজুমদারকে ম্লান করে দিয়েছে। সুধীনকে তার পৈতৃক প্রভাব থেকে দূরে রাখতে হবে।

অনেকবার, অনেকবারই তিনি রমার কাছে অনুযোগ করেছিলেন, রমাও কয়েকবার দিদিকে বলেছিল, কিন্তু সুপ্রভা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সবকথা। বলেছিল, ওসব আমরা কি বুঝি বল্‌তো। তবে এটুকু জানি, আমার স্বামীর পথ ভুল নয়।

সত্যি; সুপ্রভা দরিদ্র, জগদীশবাবুর আয় অতি সামান্য, তবু সুপ্রভার মনের কোণে স্বামীর সম্বন্ধে ওই বিশ্বাসটুকুই ছিল সান্ত্বনা, গর্বও।

রমারা বড়োলোক, মজুমদার সরকারের বড়ো কর্মচারী, কি যায় আসে তাতে? মজুমদার পছন্দ করুন আর নাই করুন, স্বামীকে সে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না।

সুপ্রভার কথা শুনে রমা মুখ ম্লান করেছিল। সুপ্রভা হেসে ওর গালটা একটু টিপে দিয়ে বল্ল, বেশ তো যা না তোর জামাইবাবুর কাছে। এসব বিষয়ের আমরা কতটুকুই বা বুঝি?

জগদীশবাবু হাসতেন। খানিক পরেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলতেন, দরিদ্র আমরা। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ পরাধীনতার নাগপাশ আমাদের ক্লীব করে রেখেছে। আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে আমরা অসীম শক্তিধর, অমৃতের উত্তরাধিকারী। চারপাশে দুঃসহ অন্ধকারের স্তর যুগান্তরের পাষাণচাপে দুর্ভেদ্য অন্তরাল সৃষ্টি করেছে। আমরা আলো হারিয়েছি সু, দৃষ্টির আলো, হৃদয়ের আলো, যে আলো চিরদিন স্থির উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে থেকে মানুষকে অন্ধকার থেকে পথের নির্দেশ দেয়।

ঘুমন্ত পুত্রের দিকে চেয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলতে লাগলেন জগদীশবাবু, সুধী ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক। আমাদের জীবন আমাদের শতাব্দী এই আঁধারে আঁধারেই কেটে গেল। আলোর তপস্যা আমাদের। সূর্যালোকের মত আলো—পৃথিবীর সমস্ত গ্লানি যুগ যুগান্তের ক্লেদ একদিন সে প্রখর আলোর বন্যায় কোথায় দূর হয়ে

যাবে, কেউ তা বলতে পারবে না। অমৃতের অধিকারী হবে ওরা। ওদের জন্যেই আমাদের তপস্যা। আর কেউ না বুঝুক সুপ্রভা, তুমি ভুল বুঝো না। এর আস্বাদ তোমাকে যেন স্পর্শ করে।

অভিমানভরে মজুমদারের নাম তিনি উচ্চারণ করলেন না। সুপ্রভা তা বুঝতে পারলো।

নিকষ কালো অন্ধকারের ঘূর্ণাবর্ত। মানুষকে কালো করে দেয়, দৃষ্টি বন্ধ করে দেয়। চলতে দেয় না। দু শতাব্দী কেটে গেল, এই দুস্তর সাগর কেউ অতিক্রম করতে পারলো না। আহ্বান এসেছিল সেদিন, বার্ধক্য-জরাজয়ী সর্বস্বত্যাগী এক নির্ভীক বৃদ্ধের আহ্বান: এ সমুদ্র কে অতিক্রম করবে এসো। এ কাজ তোমাদের, আমাদের, সবার।

দুঃখরজনীর শেষে নোতুন উষার আলোক আনতে গিয়েছেন জগদীশবাবু। শান্ত নিস্তব্ধ মৃত্যু। কলরবহীন। উপরে নামহারা অগণিত নক্ষত্রকুল। নিম্নে সীমাহীন অপার সিন্ধুজল। অগণ্য সংখ্যাতীত আবর্ত। সংক্ষুব্ধ উদ্বেল পৃথিবী। এ মৃত্যু যেন নিঃশব্দে ঝরে পড়া এক ফোঁটা বৃষ্টির মত। শান্ত সমাহিত দেহ। যেন বিরাট রণপ্রান্তরে পরিখার পশ্চাতে শহিদ সৈন্যের শব্দহীন সমাধি।

সূর্যকরোজ্জ্বল দিগন্ত কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে, তবু আকাশে রামধনুর আভাস।

অন্যদিনের চেয়ে আজ অতি ভোরেই সুধীনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই মনে পড়লো আজ তার সম্বর্ধনা-দিবস। কলেজের বন্ধুরা তার

বি. এ-তে ফার্স্ট হওয়া উপলক্ষে অভিনন্দিত করতে চায়। ভাবতেই সুধীনের মনে রোমাঞ্চ বোধ হলো। কত দিন কত রাত সে এই মজুমদার পরিবারের স্বল্পায়তন ঘরটীতে থেকে এই দিনটার জন্য প্রতীক্ষা করেছে। কি চমৎকার লাগছে আজ। সুধীন আর একবার হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে থাকলো।

মেশোমশাই মিষ্টার মজুমদারকে সে জানে। গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্মচারী তিনি—সরকারী মহলের বিরাট ব্যক্তিত্ব। এ সংসারের কর্তা। এ বাড়ীর যা কিছু তাঁর খুশিতে চলে, তাঁর পছন্দই এখানকার অভিমত। ছেলেরা তাঁর আদর্শেই মানুষ হয়েছে। বড় সুধাংশুপ্রকাশ বি. সি. এস পরীক্ষা দিয়েছে—পরীক্ষার ফল এখনো বেরোয় নি। তবে কৃতকার্য হবেই জানা কথা। কৃতকার্য হলে সেও বাপের মত রাইটার্স বিল্ডিংএ যাতায়াত করবে। এরি মধ্যে সে বাবার সংগে হরেক পার্টি ও মজলিশে যেতে শুরু করেছে। স্যুট পরে সর্বদা, দেশী পোষাকে তাকে নাকি মানায় না।

মেজ ছেলে বিনয় সুধীনের সংগে বি. এ পাশ করলো। সুধীনের সংগে তার মোটে মেলে না। কথাবার্তা খুব অল্পই হয়, কারণ সাক্ষাৎও বেশী হয় না। দুজনের কলেজও ভিন্ন। বিনয়ের সংগে সুধীনের যদি বা কখনো দীর্ঘ আলাপের সূত্রপাত হয় তো সূচনাতেই বেধে যায় তর্ক। বিনয় শুরুতেই ভারিক্কি চালে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে যায়, সুধীনের কিন্তু তা মোটেই পছন্দ হয় না। বিরোধী মতকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে সুধীন যখন তার মতবাদ বিনয়কে মানতে বাধ্য করার উপক্রম করে, সেই মুহূর্তে বিনয় কোনো ওজর দেখিয়ে সরে পড়ে। সুধীনকে সে সহ্য করতে পারে না।

এ বাড়ীতে একজনের সংগে সুধীনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সে হলো রমার তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র পরাগ। বয়স তার বেশী নয় মোটেই, ফার্স্ট ক্লাশে পড়ছে। এ বাড়ীর আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়ায় সে যে কি করে বিদ্রোহের পতাকা তুলতে সাহস পায়, সেটাই আশ্চর্য। স্বামীর মতের অনুগামিনী হয়ে রমা এখানকার

আবহাওয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন যে এখানে কেউ অন্যরকম ভাবার অবকাশ পায় না। পরাগ কিন্তু ওসব গ্রাহ্যও করে না। তার ভালো লাগে না এই রকম বাঁধাধরা নিয়মে চলতে। এটা কেমন যেন একটা বদ্ধ স্রোত। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করে, ষ্টেটসম্যান পড়ে রাজনীতির জ্ঞান সঞ্চয় করে, ভবিষ্যতে রাইটার্স বিল্ডিং ও বাড়ী, বাড়ী ও রাইটার্স বিল্ডিং করার উচ্চাশাকে সে আমল দেয় না। হিন্দু ইস্কুলে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল, সে নিজেই ধর্মঘট করে মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হয়েছে। বিশাল প্রাচীন বটের ফাটলধরা বিবর্ণ শিকড়ের পাশে শাখা হতে নেমে আসা কচি ঝুরির মত পরাগ। সুধীনকে সে ভালবাসে। সুধীনেরও ভালো লাগে ওকে। মজুমদার পরিবারের কারণে অকারণে হর্ন বাজিয়ে বিশাল মোটরকার হাঁকানো, সাধারণ মানুষের সমাজে কথোপকথনের সময় মেকী ভালোমানুষের মুখোশের অন্তরালে আত্মগোপন করা, যে সভ্যতা অন্তঃসার শূন্য ও অবান্তর সেই সভ্যতার ওজনে মাপ করে হাসা, তথাকথিত রুচি-মাফিক রসিকতার হুল্লোড় তোলা—সুধীন যখন এসব বিশ্লেষণ করতে বসে, তখন তার হাসি পায়।

মজুমদার ভবনের সুউচ্চ চূড়ার স্বল্পায়তন ঘরটা সুধীনের অধিকার-ভুক্ত। সুধীনই ওটা বেছে নিয়েছে। কেউ আপত্তি করে নি। তেতলার এই ঘরটা ছোট্ট, একটা মাত্র জানলা, ছাদ নীচু। তা সত্ত্বেও ঘরটার প্রতি সুধীনের বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কারণ হলো এত উর্ধ্বে ওদের সাংসারিক কোলাহলের কুটিলতা এসে পৌঁছায় না। সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিলে নীচের সংগে চিলকুঠুরীটার কোনো সম্বন্ধ থাকে না। দিব্যি শান্তিতে যে জন্য সে এখানে রয়েছে অর্থাৎ পাঠ-চর্চায় মন-সংযোগ করা যায়।

জানলা দিয়ে সকালের আলো এসে পড়লো। বিপরীত দিকের দেয়ালে চতুষ্কোণ রোদ্দুরের ছাপ পড়লো। সমস্ত ঘরটাতে এসে গেল একটা স্বর্ণাভা। আলোতে এত সোনা কেন, কি হাসিখুশি- হালকা দিনটা! সুধীন এবার উঠে

পড়লো। বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় জানলা দিয়ে তার চোখ পড়লো একটী বাড়ীর ছাদের ওপরে সূর্যপ্রণামরতা একটী মেয়ের ওপর। সুধীনের ঘর থেকে ছাদটার দূরত্ব কিছুই নয়—কয়েকটা বাড়ী পরে মাত্র।

সূর্যপ্রণামের ভংগীটা সুধীনের ভারী ভালো লাগলো। গভীর ভক্তি ও মন্ত্রের অনুধাবন থাকলে এমন সুন্দর ভাব আসে। মেয়েটী যেন শিল্পী—প্রণাম তার শিল্প। দেবতার উদ্দেশ্যে সে প্রণাম বিলিয়ে দিচ্ছে।

বাড়ীটা কাদের সে জানে। তারই বন্ধু প্রদীপদের। মেয়েটী বোধ হয় ওর বোন-টোন কেউ হবে। ওদের বাড়ীতেই তো আজ উৎসব।

এসে ধরে নিয়ে গেল ওকে। বল্লে, এ কী! এ সাধারণ পোযাকে তোমার যাওয়া হতে পারে না। সিল্কের পাঞ্জাবী নেই? না থাক, আদ্দির জামা আছে তো। শান্তিপুরী একটা কাপড় পরে নাও ভাই। ফোটো একটা তোলা হবেই। আচ্ছা, পাম্পসুটা এত ময়লা কেন? কতকাল কালি পড়ে নি? বলে সে নিজেই সুধীনের পুরোনো কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে জুতোটাকে পরিষ্কার করবার উপক্রম। সুধীন তখন জুতোটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নিজেই পরিষ্কার করে ফেল্ল।

সুধীন হেসে জিজ্ঞাসা করলো, এত সাজ করিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছিল বলতো? সম্বর্ধনা না উদ্বাহ-বন্ধন?

—যে কোনো একটা হতে পারে, প্রদীপ জবাব দিল, তবে উদ্বন্ধন নয় নিশ্চয়। কিন্তু ওই আধ ময়লা শার্ট আর কাপড়ে টাটকা ফুলের মালা যা মানাতো! এখন কিন্তু যা দেখাচ্ছে!

কিরকম দেখাচ্ছে, সুধীন কৌতুক বোধ করলো।

চার্মিং। নূরজাঁহা থাকলে দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়ে বোখারা সমরকন্দ জায়গীর দিতেন।

প্রদীপ ওকে টানতে টানতে নিয়ে এলো তাদের বাড়ীতে। হলঘরের ব্যাকডোর দিয়ে ওরা বাগানে এলো। উৎসব-প্রাংগন করা হয়েছে বাগানে। চমৎকার সাজানো হয়েছে স্থানটী। মরশুমি ফুলের এক একটী ঝাড় কেন্দ্র করে গুটি কত ফোল্ডিং চেয়ার ও টেবিল। এমনি অসংখ্য। মাথার উপরে রঙীন চাঁদোয়া। সুধীনের কলেজের বন্ধুরা আগেই এসে হাজির হয়েছে। ওরা ছাড়া আরো কয়েকটী মেয়েও এসেছে। সুধীন দেখলো তাদের মধ্যে ভোরের দেখা সেই মেয়েটীও রয়েছে। সেসময় একবার চোখোচোখি হয়েছিল তার সংগে। সুধীনকে দেখে তার মুখটা আরো লাল হয়ে উঠেছে।

সুধীন আসতেই বন্ধুরা থ্রি-চিয়ার্স দিল, জয়ধ্বনি করলো। ভাবুক বংকিম এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালোঃ হে বিজয়ী বীর, তোমার আবির্ভাবে আমরা আশ্বস্ত হলুম। এতক্ষণ তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম। মোদের বন্দনা লহ।

পকেট থেকে এক মুঠো ফুল বার করে ছড়িয়ে দিয়ে সে বল্ল, আর এই কুসুমাস্তীর্ণ পথে তুমি পা ফেলে এসো।

সবাই হেসে উঠলো বংকিমের শেষ কথায়। প্রদীপের ছোট্ট বোন মিন্টু এসে চন্দন পরিয়ে দিল সুধীনের কপালে। রজত মল্লিকাফুলের মালা পরালো। শাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতী, কপালে চন্দনের কারুকার্য, গলায় শ্বেতপুষ্পের মালা—সুধীনকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। মাথার ওপরে রঙীন চাঁদোয়া সূর্যের আলো প্রবেশ করতে দিলেও প্রখরতা লোপ করে দিয়েছিল। ফুলগাছের মধ্যে দুএকটী রঙীন বিজলীবাতিও ঈষৎ আলোদান করছিল। এক দিকে বন্ধুরা, অন্যদিকে মেয়েরা—তারা কেউ পরে এসেছে নীলাম্বরী, কেউ বাসন্তী কেউ বা শিউলি বকুলের মত শাদা শাড়ী। সব মিলে একটা দুর্লভ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

একটু দাঁড়াও তোমরা, বলে প্রদীপ ছুটে গেল বাড়ীর মধ্যে। মাকে ধরে টানতে টানতে সভার মাঝে নিয়ে এসে বল্ল, আজকের উৎসবে আশীর্বানী দেবেন আমার মা। মা, দাও তো একটু ধান-দুর্বো—

প্রদীপের মায়ের পরণে গরদের শাড়ী। প্রৌঢ় তাঁকে বলা চলে না। সদ্য স্নান করে এসেছেন। চুলগুলো তাই এখনো ভিজে। মিনুর হাতের থালা থেকে দুর্বাচন্দন নিয়ে বল্লেন, দুর্বার মত মনটী তোমার কিশোর হোক, চন্দনের মত পবিত্র হোক তোমার বাণী আর এই ধানের শিষটীর মতই উন্নত হোক তোমার মনুষ্যত্ব। সুধীনের মাথায় হাত রেখে তিনি আশীর্বাদ করলেন।

বাঃ, কি সুন্দর আশীর্বাদ 'আপনার মা, রজত বলে উঠলো, শুধু আশীর্বাদই নয়, কিছু বলতে হবে এবার। আমাদের সভার প্রথম বক্তা আপনি।

মা হেসে বল্লেন, তোদের কথায় আমি বক্তৃতা দিলুম আর কি! তোদের মত পাগল কিনা আমি!

প্রদীপ বল্ল, বলো না মা কিছু, সবাই যখন শুনতে চায় তোমার মুখ থেকে—

কি বলবো আমি, মা বল্লেন, মুখে না বল্লে কি বলা হয় না? সুধীনের সম্বন্ধে প্রদীপের কাছ থেকে আমি অনেক কথা শুনেছি। সুধীনের বাড়ীর কথাও আমি জানি। তোদের মত বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস আমার নেই তো, তাই শুধু বলি প্রদীপ আমার যেমন ছেলে, সুধীন বা তোরাও আমার কাছে তাই। তোরা মানুষ হ, এই কামনা করি।

সুধীন তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বল্ল, এ আমি কখনো ভাবি নি আজকের মত দিন আমার জীবনে আসবে। এ সৌভাগ্যের মর্যাদা যেন রাখতে পারি। আজকের কথা আমি ভুলবো না কোনোদিন।

আমি যাই এবার, তোদের খাবারের ব্যবস্থা করিগে। প্রদীপের মা ভেতরে চলে গেলেন।

প্রদীপ রজতকে জিজ্ঞাসা করলো, আমাদের পরবর্তী সূচী কি হে রজত?

রজত কাগজ খুলে দেখে বল্ল, এবার স্বর্ণ চৌধুরীর কবিতা আবৃত্তি। বলে সে মেয়েদের দিকে চাইলো।

স্বর্ণ চৌধুরী নামে এবার যে মেয়েটির পালা, সে হলো সেই ভোরের দেখা

মেয়েটি। সে উঠে আসতেই সুধীন দেখলো তার উগ্র গৌরবর্ণ মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সে আবৃত্তি শুরু করলো :

অন্ধকার নীহারিকাপথে নক্ষত্রেরা কানাকানি করে,
অক্লান্ত প্রতীক্ষা তাদের প্রহরে প্রহরে।
কতটুকু ক্ষীণ আলো আর ক্ষুদ্র পরিচয়
তবুও মনেতে তোলে অদ্ভুত বিস্ময়।

আমি তো চিনিনা ওদের, ওরা চেনে মোরে
আমারি রজনী লাগি ওরা থাকে জেগে
তাই তো শিহরি উঠি অজ্ঞাত প্রহরে
ওদের স্পন্দিত শ্বাসের তীক্ষ্ণ স্পর্শ লেগে।

অন্ধকার যাত্রাপথে জেগে থাকে কালের প্রহরী
তন্দ্রাহীন রক্তনেত্র জেলে
আমি যত দূরে যাই ততই সে আসে সরি
অতিকায় পক্ষ দুটো মেলে।

আমার মনের কথা আজো যে হলো না বলা
হে আমার অপূর্ব বিস্ময়
কতবার কত রাতে ডেকেছি তোমায়
তুমি মৌন করেছ সঞ্চয়।

মেয়েটীর কবিতা আবৃত্তির সময় সুধীন মিটিমিটি হাসছিল। আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই রজত চেঁচিয়ে বল্ল, এতো সুধীনের লেখা কবিতা।

স্থধীন বল্লে, ওটা সম্প্রতি বেরিয়েছে অপরাজিতায়।

স্থবর্ণ বল্লে, অপরাজিতা থেকেই ওটা সংগ্রহ করেছি।

রজত জানালো, ওটা আমাদের এই স্থধীন্দ্রের লেখা। আপনার ভালো লাগাটা স্থধীনের পক্ষে সার্টিফিকেট। এই দেখুন না, আমিও কবিতা লিখি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কাকেও বলতে দেখলাম না যে আমার কবিতা পড়েছে।

রজতের আক্ষেপে স্থবর্ণ হাসলো। পাতলা ঠোঁটদুটী তার ঈষৎ নড়লো মাত্র, মুখের ডৌলটা একটু বাঁকলো। স্থবর্ণ হাসলো কিনা বলা যায় না, হাসির উদাসীন প্রচেষ্টা করলো। কিন্তু তাতেই তাকে দেখালো অপরূপ, যেন এক ঝলক রক্ত এসে জমলো তাঁর শ্বেতশুভ্র কপালে ও গালে। স্থধীন তা দেখে শুধু মুগ্ধ হলো আর রজত হলো কৃতার্থ।

এর পর রজতের কবিতা। সে উঠে দাঁড়িয়ে সমাগত বন্ধু-বান্ধবীদের উদ্দেশ করে বল্লে, আমি এবার একটী কবিতা পাঠ করবো। কবিতাটী আমারই লেখা, কপিরাইটও আমার। স্থতরাং বিনামুমতিতে কেউ অন্যত্র প্রকাশ করলে বা পাঠ করলে তাকে যথোচিত সাজা দেবার ইচ্ছা আছে। আজ পর্যন্ত আমি দুশো ছত্রিশটা কবিতা লিখেছি। তার মধ্যে এটী আমার শ্রেষ্ঠ রচনা এই বিশ্বাসই আমি পোষণ করি।

স্থধীন রজতের কথা শুনে বল্লে, নাও হে শুরু করো। প্রত্যেকবারই তোমার কবিতা রচনার পর আমরা শুনে আসছি এটী তোমার শ্রেষ্ঠ রচনা। তোমার কথামত বিচার করলে দাঁড়ায় যে দুশো ছত্রিশটী কবিতার মধ্যে দুশো ছত্রিশটীই শ্রেষ্ঠ। কোনটা কারুর চেয়ে কম নয়।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। রজত অপ্রতিভ হয়ে বল্ল, তুমি কিচ্ছু বোঝো না স্থধীন।

স্থধীন বল্ল, আমি স্বীকার করছি বুঝি না।

রজত তখন গলা পরিষ্কার করে বল্ল : গদ্য কবিতা, মিল নেই

সুন্দরবনে একটী বাঘ বেরিয়েছিল—

রজতের কবিতা শুরু হওয়ামাত্রই ফের হাসির হুল্লোড় উঠলো। রজত চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করার পর সুধীনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই সুধীন তাড়াতাড়ি কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সংগে বল্ল, আমি হাসছি না কিন্তু!

প্রদীপের ছোট্ট বোন মিনু চুপচাপ এদের কথাবার্তা শুনছিল। সে এবার বল্লে, ওমা, ওটা যে আমাদের কথামালার গল্প—

না, না, কথামালার গল্প নয় মিনু, রজত অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে, খুব ভালো পদ্য, শোনো তোমরা :

সুন্দরবনে একটী বাঘ বেরিয়েছিল
প্রকাণ্ড এক বাঘ,
ডোরাকাটা গা লেজটা আড়াই হাত,
হালুম করে এক লাফে ঝোপের মধ্য হতে
বেরিয়ে এলো আলুর ক্ষেতে,
চাঁষারা যেখানে কাজ করছিল।
হৃষ্টপুষ্ট একটী লোকের কাছে গিয়ে
বাঘটা বল্ল : হালুম, আজ তিন দিন উপবাসী
বড্ড ক্ষিদে,
আমায় আহার্য দাও, পুণ্য হবে তোমার।
লোকটা ভীত হলো। বল্লে :
সে কি! তুমি আমাকে খেতে চাও?
বুদ্ধ চৈতন্যের দেশে এখনো তোমার হিংসার শেষ হলো না?
গান্ধীও যে বেঁচে আছেন।
তোমার হিংসাপ্রবৃত্তি শুনলে তিনি ব্যথিত হবেন,

তাতে তোমার ও তোমার সমাজের মুখ ম্লান হবে।
এবং ব্যাঘ্রকুলের ইতিহাস লেখকরা তোমার নাম
কালো অক্ষরে লিখে রাখবে।
শুনে বাঘ ভড়কে গেল, তাই তো!
লেজটাকে ঘুরিয়ে গালের উপর রেখে
অনেকক্ষণ সে চুপটী করে বসে রইলো।
তারপর একসময় ঝরঝর করে কেঁদে ফেল্ল।
লেজ দিয়ে চোখের জল মুছে বল্লে,
আমার কি উপায় হবে প্রভু?
আমায় তুমি দীক্ষা দাও।
আমি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবো।
সুন্দরবনের কচি তৃণগুচ্ছ চর্বন করে
বাঘের নবজন্ম হলো।
কপালে তিলক গলায় কণ্ঠী নিয়ে
সে বৃন্দাবনে চল্ল।

কবিতা পাঠ শেষ করে রজত প্রদীপকে বল্ল, বড্ড টায়ার্ড ফিল্ করছি, এক গ্লাস জল।

সুধীন জিজ্ঞাসা করলো, রচনার তারিখ কত?

রজত গম্ভীর মুখে জবাব দিল, আটুই আশ্বিন ১৩৪৮।

শুনে সুধীন মন্তব্য করলো, বাংলা কবিতার পক্ষে তারিখটা নিঃসন্দেহে গ্লোরিয়াস। স্মরণ করে রাখার মত।

রজত বললো। এবারে বংকিমের পালা। সে কিছু বলবে।

সে উঠে চশমার পুরু পরকলা রুমালে বেশ করে মুছে বক্তার বিশিষ্ট ভংগী করে আরম্ভ করলো, এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ কাহিনী। গিয়েছিলাম দেশভ্রমণ করতে।

ঘুরতে ঘুরতে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছালাম যেখানে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। বিশাল একটা প্রান্তর, অনবরত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া, গাঢ় নীল ধোঁয়া। দৃষ্টি রোধ হয়ে গেল, মনের কৃষ্টি হারালো, ভাবলাম সৃষ্টি লোপ পেল, কিন্তু একটু পরেই দেখলাম সমস্ত ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে। নির্মেঘ আকাশে রোদ গলে গলে পড়ছে। লোকগুলো উল্টো হাঁটছে। খাচ্ছে শাদা জল, বলছে অমৃত। হাসতে গিয়ে কেবলি কেঁদে ফেলছে, কান্নাটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। পথ হারিয়ে একই আবর্তে পড়ে সারাদিন ঘুরপাক খেয়ে মরছে।

ব্যস, ওই পর্যন্ত, যথেষ্ট হয়েছে, সুধীন হাত নেড়ে জানালো, এবার সমাগত সকলকে জানিয়ে দাও জায়গাটার নাম কী।

বংকিম জানালো, সেটা এখন উহ্য থাকবে।

এমন সময় প্রদীপদের বাড়ীর ভিতর থেকে আহারের ডাক পড়লো। আহারের বন্দোবস্ত হয়েছে ভিতরে।

এবার যাবার আগে সকলের অনুরোধে সুধীনকে উঠে দাঁড়াতে হলো। উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে সে বলতে লাগলো, আজকের মত দিন জীবনে খুব দুর্লভ হয়ে আসে। সংগীদের ভালোবাসার মধ্যে, মধুর উৎসবের মধ্যে, সকলের শুভেচ্ছা ও হাসির মধ্যে মুহূর্ত যাপন সাধারণ মানুষের জীবনে খুব কম আসে। আজকের কথা বহুদিন আমার মনে থাকবে। কিন্তু এই যে এত আনন্দ অনুভব করি, এ যেন কত ব্যথা-বেদনায় ভরা। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ হাসে, কড় কড় গম্ভীর আওয়াজ হয়, তবু সেই মেঘই শেষকালে জল ঢালে। আমাদের এই আনন্দোৎসব সবই তো হাসির আবরণে ঢাকা, সামান্য আঘাতেই আবরণ ছিঁড়ে যায়। হাসতে গিয়ে আমরা কেঁদে ফেলি। একদিনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে সেই জন্যে আমরা বহুদিনের স্মৃতিতে ধরে রাখি।

সুধীন চুপ করতেই প্রদীপ অনুরোধ করলো, হাসতে গিয়ে আমরা কেঁদে ফেলি, এই কথাটা আরেকবার বুঝিয়ে দাও না ভাই।

এতো আমরা পদে পদে প্রতিক্ষণে অনুভব করছি, সুধীন ম্লান হেসে বল্ল, শিক্ষালাভ করতে গিয়ে আমরা নিয়ে আসি বিদেশীর শিক্ষা। ইতিহাস পড়তে গিয়ে পড়ে আসি বিদেশীর বিকৃত কুৎসা। আমার দেশের মাটি, আমার দেশের রাজপথ, সেও দেশী নাম পায় না। যে দেশের মানুষ আমি, যার প্রতি ধূলি স্বর্ণরেণুর মত, তাকে সহজ সুস্থ করবার অধিকার আমার নেই। আমি কিছুতে ভুলতে পারি না, এদেশের স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার, বলতে বলতে সুধীন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, আমি বুঝতে চাই না ইংরাজ আমাদের বন্ধু, ইংরাজ আমাদের স্বরাজ দেবে। অহরহ আমার মনে হয়, আমার বৃদ্ধ বাবার মৃত্যু হয়েছে ব্রিটিশের কারাগারে। সে কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারি না। সত্যাশ্রয়ী নির্ভীক মানুষ ছিলেন আমার বাবা। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হতে চেয়েছিলেন এই তাঁর অপরাধ। এ আমার জীবনের বৃহত্তম বেদনা, এ আমার জীবনের বৃহত্তম আনন্দও।

আহারের ডাক পড়লো ফের। সবাই উঠে ভিতরে গেল। সুধীনকে প্রদীপের মা বসে থেকে খাওয়াতে লাগলেন। পরিবেশন করতে লাগলো সেই মেয়েটী—সুবর্ণ। সভায় যে কাপড়টী পরেছিল, সেটা এবার বদলে এসেছে। সভায় ছিল তার বাসন্তী শাড়ী, এখন পরে এসেছে একটী আগুন-রঙা। সুধীনকে পরিবেশন করতে গিয়ে তার মুখে কাপড়ের রংয়ের আমেজ লেগেছে।

প্রদীপের মা সুধীনকে জোর করে খাওয়াতে লাগলেন। সুধীনের ইচ্ছা হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করে এই পরিবেশনরতা মেয়েটী কে। সে অনুমান করছিল নিশ্চয় সে প্রদীপেরই বোন হবে।

ভারী ভালো লাগছিল তার। এত আদর এত আনন্দ এত কোলাহল সব তাকে কেন্দ্র করে। প্রদীপের মা ওকে দেখেশুনে খাওয়াচ্ছেন, সুবর্ণ নিজে তাকে পরিবেশন করছে, একী সে কোনোদিনও ভেবেছিল!

জীবনে এ রকম দিন অকস্মাৎ আসে।

বিকালের আলো ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে এলো। প্রদীপদের ড্রইং-রুমে জোর বাতির আলো জ্বললো। অতিথিদের যথারীতি আপ্যায়ন হলো। তারপর সন্ধ্যাও অতীত হলো। লনের কৃষ্ণচূড়ার মাথায় একটী দুটী করে অনেকগুলি তারা জাগলো। বাদুড়েরা পাখা মেলে আশ্রয়ের জন্যে উড়ে গেল। আকাশে এলো একটা শান্ত অনুত্তেজক আবহাওয়া।

এক এক করে অতিথিরা বিদায় নিলো। সকলের শেষে উঠলো সুধীন। সবার কাছে বিদায় নিয়ে সে চলে এলো। ড্রইংরুম থেকে নেমে এলো লনে। লাল কাঁকর ঢালা সরু রাস্তা দিয়ে প্রদীপের সংগে সে চৌধুরীদের বাড়ী থেকে চলে এলো। ফিরে আসার সময় একবার কি ভেবে পিছনে তাকাতেই দেখলো অন্ধকার লনের ছোট্ট গেটে হাত রেখে সুবর্ণ তার চলে যাওয়ার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। লজ্জিত হয়েও সুধীন প্রদীপকে জিজ্ঞাসা করলো এবার, ও কে ?

প্রদীপ জবাব দিল, আমার বোন সুবর্ণ।

বাড়ী এসে নিজের চিল-কুঠুরীর ঘরে ঢুকতেই সুধীন দেখলো পরাগ তার বিছানায় উবুড় হয়ে শুয়ে তারই একখানা বই মনোযোগের সংগে পড়ছে। সুধীন যেতেই সে উঠে পড়ে একটা চিঠি দিল তার হাতে। বল্লে, দুপুরে এসেছে।

বাড়ীর চিঠি। কিন্তু খামের উপরে বরাবরকার মত মায়ের হস্তাক্ষর তো নেই। সুধীন তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে পড়তে লাগলো। তারপর চুপটি করে বসে পড়লো বিছানায়। পরাগ তখন সেই বইটা পড়ছে। বই থেকে মুখ না তুলেই সে জিজ্ঞাসা করলো, কি খবর বাড়ীর ?

ভালো নয়, সুধীন উত্তর দিল, মায়ের অসুখ।

বই থেকে মুখ সরালো পরাগ। বল্লে, তাহলে কালই যাচ্ছ নাকি?

সুধীন বল্লে, কালই যাবো। যাবো যাবো করছিলুমই, ঘুরে আসি। ঘুরে এসে এম. এ কোর্সে ভর্তি হবো।

পরাগ বল্লে, মাসীমাকে দেখতে আমারও বড় ইচ্ছা হয় সুধীদা। চলো না আমিও তোমার সংগে যাই।

পাগল! সুধীন ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলো, তুই আমার সংগে যাবি মানে? জীবনে কোনোদিন পাড়াগাঁয়ে যাসনি, মাসীমাই বা তোকে ছাড়বেন কেন?

মা কিছু বলবেন না, মাকে মত করিয়ে নেবো, তাছাড়া, পরাগ উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্ল, পাড়াগাঁ সম্বন্ধে আমার মনে একটা রোমান্স আছে জানো?

সেটা পাড়াগাঁয়ে যাসনি বলে, সুধীন জবাব দিল হেসে, দূর থেকে শহরে বসে কাব্য পড়ে পল্লীগ্রামকে রোমান্টিক লাগে, কিন্তু আসলে তা নয়। সেখানে গিয়ে দেখবি লোকগুলো শিক্ষিত নয়, কুসংস্কারে ভরা মন, পরনিন্দা করতে পারলে আর কিছু চায় না। সেখানে সন্ধ্যার পর খাঁ খাঁ অন্ধকার, ডোবার জলে পচা গন্ধ আর ম্যালেরিয়ার বিষ, তাছাড়া সামনে বর্ষা, হাঁটুভোর কাদার রাজত্ব। তার ওপর তোমাদের মত আমরা ধনী নই, জমিদারও নই, সুতরাং বর্ষায় আমাদের ঘরের চাল দিয়ে মেঝেয় জল ঝরে, বিছানা ভেজে, মাটির দাওয়া জলে-কাদায় পেছল হয়, উঠোনের কোণে অন্ধকারে সাপ বেরোয়। সেখানে তোর যাওয়া চলে না।

হুঁম্, বুঝলাম, পরাগ গম্ভীর হয়ে বল্ল।

সুধীন ওর দিকে চেয়ে একটু পরে বল্লে, নিয়ে যাওয়ার রিস্কও করতে পারতাম ভাই, কিন্তু আমি জানি মাসীমা তোমায় যেতে দেবেন না।

না দিক, আমি জোর করে যাবো। ওদের বাধানিষেধ বিচার করবার বুদ্ধি আমার হয়েছে, পরাগ ক্রুদ্ধ হয়ে বল্ল।

রাগ করিস না, সুধীন ওর কাঁধে হাত রাখলো, মায়ের অসুখ। কিরকম আছেন জানি না, তুই পরে যাস।

কাঁকনতলার জীবনে চাঞ্চল্য এসেছে। ভোঁতা নিরুৎসাহ জনতা প্রাণ পেয়েছে যেন। জাপানীরা রেংগুনে বোমা ফেলেছে। হাজারে হাজারে লোক মরেছে নাকি। তাইতো, রেংগুন গেলে এদেশও গেল!

কৃপাময় বিশ্বাস লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো পিঠ সটান করবার বৃথা প্রয়াস করে বল্ল, ভারতের দ্বার হলো রেংগুন। ওই দ্বার ভেঙে জাপানীরা এদেশে ঢুকবে জেনো।

হরিহর কাঁকনতলা গাঁয়ে মুদীর ব্যবসা করে। মাঝে মাঝে কোলকাতায়ও যায়। বিজ্ঞের মত বল্লে, শুনেছি বর্মীদের ওরা কিছু বলছে না। ব্রিটিশদের তাড়িয়ে ওদেরই নাকি স্বরাজ দিয়ে দেবে।

হুঁঃ! অবিশ্বাসের সংগে সেই কথাটা শুনে নিধু কোবরেজ জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে অতগুলো লোককে মারলো কেন শুনি?

তুমি কেন কথা বলতে আসো খুড়ো, কি বোঝো তুমি? কোবরেজের জাপান-বিরোধী প্রশ্নে হরিহর একটু চটে ওঠে—

বটে, বুঝি না কিছু? চোখ পাকিয়ে নিধু কোবরেজ বলে, দেমাকটা ভালো নয় রে হরে। লড়াই বেধেছে, সব ওলট পালট হতে কতক্ষণ!

হরিহর কোনো জবাব দিল না, তার মুখে একটা প্রখর বিদ্রূপের ভংগী ফুটে

উঠলো। কিছু বলা প্রয়োজন মনে করলো না সে। লড়াই লেগেছে, সত্যি সব ওলট পালট হতে কতক্ষণ! কোলকাতা উজাড় হতে শুরু হয়েছে, শহরের যত লোক সব মফঃস্বলে আসছে, গ্রাম ভরে উঠেছে। কাঁকনতলাও ভরে উঠেছে, হরিহরের খরিদ্দার বাড়ছে। তাছাড়া, ব্যাপারীদের কাছ থেকে সে আরেকটা কথা জেনেছে, সেটা সে এখনো কাউকে জানায় নি।

রেংগুন যদি যায়, বংগোপসাগরে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। চাল আসবে না ওখান থেকে। আড়তদাররা চাল ধরে রাখতে শুরু করেছে এরি মধ্যে। বেশী চাল এখন ছাড়া চলবে না। সকলেই যে যার মাল আটকে রাখছে। বর্মার চাল না এলে সত্যি ভয়ানক ব্যাপার হবে, ভীষণ চড়ে যেতে পারে দাম। দুর্ভিক্ষও হতে পারে। হরিহরের ঘরে এখন কম করে দেড়শো মন চাল আছে, ছোট্ট গ্রামের পক্ষে ওই যথেষ্ট। ও চালটা সে আর বার করবে না। এখন চাহিদা বাড়ছে লোক বেড়েছে বলে। হরিহর ঠিক করেছে সাধারণ চাহিদা মিটাবে সে নূতন খরিদ করে। আর ওই দেড়শো মন চালের সংগে আরো অন্তত পাঁচশো মন চাল মজুত করে রাখবে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে পরে তখন অল্প অল্প করে মাল ছাড়বে।

ওলট পালট হবেই। নিধু কোবরেজ বলেছে ঠিক। তবে কে ওলটাবে গণেশ পালটাবে সেকথা নিধু কোবরেজ জানে না। জানে হরিহর। সে ব্যবসায়ী লোক—স্পেকুলেশন করে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, ব্যাপারীদের কাছ থেকেও পূর্বাভাস পায়। হরিহর চায় ওলট পালট হোক। বিশ বছর হলো গাঁয়ে দোকান করেছে সে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছু হয়নি আজো পর্যন্ত; চেষ্টার কসুরও করে নি। তাই এখন হয়তো ভগবান মুখ তুলে চাইছেন। হোক ওলট পালট, হরিহর প্রস্তুত।

থম থম করছে সবার মুখ। রেংগুনে কাতারে কাতারে লোক মরেছে। নিরপরাধ নিঃসহায় অগণিত লোক। এদেরই মত। এদেরও তো কুঁড়ে ঘর,

জোরে ঝড় উঠলে উড়ে যায়, বোমার মুখে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ঠিক-ঠিকানা নেই। অবশ্য শোনা যাচ্ছে, এখানে নাকি ওরা আসবে না। আসবে কোলকাতায়, সেখানে বোমাবর্ষণ করবে। কিন্তু বিশ্বাস নেই, এযুদ্ধে কিছুই বিশ্বাস করা যায় না। কি ভয়ংকর উড়ো জাহাজগুলো! কি বিকট গর্জন, মাথার উপর শানিত ধাতব আওয়াজ করে চলে যায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। রৌদ্রে ঝলসিত হয়ে ওঠে তাদের দেহ, মনে হয় বাজের চেয়েও নিষ্ঠুর ওদের শিকার, শকুনির চেয়েও নির্ভুল ওদের দৃষ্টি, ঈগলের চাইতেও ধারালো ওদের নখর ও গতি।

হরিহর লোকটী প্যাঁচোয়া। সবাই তা জানে। হরিহরকে কথা না বলে ক্রূর বিদ্রুপের হাসি হাসতে দেখে কেউই আশ্বাস পায় না। সামনে কি দিন আসছে কেউ জানে না, জীবনের দাম যে এক কানাকড়িও না ক্রমশ সে চেতনা সবার কাছে হয় স্পষ্ট, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার খবর প্রতিদিনই তারা পাচ্ছে, সাপ্তাহিক বসুমতীর ওপর ঝুঁকে পড়ে তারা আলোচনা করে। তার ওপর শহর থেকে যারা এসেছে, সেই সব স্ত্রীলোকগুলি ঘরে ঘরে মেয়েদের কাছে গিয়ে স্বামীদের কাছ থেকে শোনা সাঙ্ঘাতিক সব মারণাস্ত্রের গল্প বলে। অন্য বিষয়ে আলোচনা প্রায় বন্ধ। অন্য কোনো কথা নেই লোকের মুখে, পাঁচজন একত্র হলেই লড়াইয়ের গল্প মানুষের দুঃসহ নিঃসহায়তার গল্প!

সুপ্রভা কাজলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, চিঠিটা নিয়ে গেছে তো?

কাজলী জবাব দিল, নিধু কাকা নিয়ে গেছে।

সুপ্রভা বল্লেন, সুধী চিঠি পেয়েই চলে আসবে ঠিক। অসুখের কথা লিখে ঠিকই করেছি, কি বল্‌মা কাজলী? কোলকাতায় কটা লোকই বা আছে এখন! দিনরাত যা শুনছি, ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে।

সুপ্রভার বাড়ীর পাশেই থাকেন কাজলীর ঠাকুরমা। কাজলীর বাবা কোথায় কোন দেশে জমিদারের গোমস্তাগিরি করেন, সামান্য অল্প টাকা মাইনে, ছোট্ট

জমিদারী তাই উপরিও বিশেষ কিছু হয় না। বাড়ীতে আসেন সেই ন মাসে ছ মাসে। সামান্য কটী টাকা মাসে মাসে মনি-অর্ডার করে পাঠান, তাতেই সংসার চলে। অবশ্য খুব ভালো চলে না, তবে পল্লীগ্রামের সংসার, ছোট্ট একটুকরা জমি আছে তাতে দুএকটা আনাজের ফলন হয়। কোনোরকমে চলে যায় এই পর্যন্ত।

কাজলীর ঠাকুমা হিরণ্ময়ী মানুষটী বেশ। পুত্রবধূকে অনেকদিনই হারিয়েছেন, কাজলীকে বুকে পিঠে মানুষ করেন তিনই। বয়স তাঁর পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে। কিন্তু দেখলে মনে হবে ঢের কম বয়স তাঁর। সংসারে আর কেউ নেই। হিরণ্ময়ী দেখাশোনা করেন সুপ্রভাকে, সুপ্রভাও হিরণ্ময়ীর কাছে গিয়ে বসেন পাশাপাশি দুপরিবারে এইভাবে একটা নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছে।

পাড়ার লোকেও এসে সাহায্য করে অনেক সময়। হিরণ্ময়ী ছোট্ট জমিটীতে কখনো তিনি কাজলীকে নিয়ে নিজের হাতেই সব্জী বীজ রুয়ে দেন, কখনো লোক ধরে করান।

কাজলী প্রায় সর্বক্ষণই থাকে সুপ্রভার কাছে। সুপ্রভার ভালো লাগে ওকে। ওই চঞ্চল কিশোরীটী তাঁর ঘরে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়, এটা ওটা টেনে দেখে, সাজায় গুছায়, সুপ্রভার চুল আঁচড়ে দেয়, গল্প পড়ে শোনায়, যেন এ বাড়ী তাদের, যেন সে অন্য বাড়ীর মেয়ে নয়। ভারী ভালো লাগে সুপ্রভার। এক এক সময় মনে হয় মেয়েটীকে আপনার করে নিতে। একেবারে কাছে রাখতে।

সুধীনের চিঠি যথাসময়েই এসেছিল, বি-এতে সে ফার্ষ্ট হয়েছে। আনন্দে গর্বে তাঁর বুক ভরে উঠেছিল। কাজলী সে খবর ছুটে গিয়ে দিয়েছিল ঠাকুমাকে। সুপ্রভার দুচোখ ভরে জল এসেছিল, সুধী ফার্ষ্ট হয়েছে! সুধী, তাঁর ছেলে সুধী, তার গরীব মায়ের ছেলে সুধী, আজ সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে, সবাইকে ছাপিয়ে প্রথম হয়ে উঠেছে তার নাম। এ আনন্দ সুধী কাছে না থাকলে কেমন করে তিনি উপভোগ করবেন! সে কেন নিজে এলো না? লিখেছে শীঘ্রই আসবে, মায়ের বুক তাতে ভরে না।

কোলকাতায় বোমার আশংকা শুনে কিছুদিন থেকেই সুপ্রভার মন ভালো নেই। মনটা তাঁর পড়ে রয়েছে সুধীনের কাছে। হুড় হুড় করে সেখান থেকে লোক আসছে পালিয়ে, ভরে উঠছে কাঁকনতলা। এই ছোট্ট জনপদ শহর হয়ে উঠছে। সুপ্রভা থাকতে না পেরে কাজলীকে দিয়ে চিঠি লেখালেন।

সুধীদার কিন্তু খুব অন্যায়, যাই বলুন আপনি, ঠোঁট ফুলিয়ে বল্ল কাজলী। সুপ্রভা যেন ওরও মা, এমন স্নেহমাখা নরম মন সে পায় নি, ঠাকুমাও দিতে পারেন না এমন অনুভূতিময় কোমলতার স্পর্শ।

সুপ্রভা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন রে ?

কাজলী জবাব দিল, এমন মাকে যে একা ফেলে যায়, সে খুব ভালো কাজ করে, না ?

কাজলীর রাগ দেখে সুপ্রভা না হেসে থাকতে পারলেন না। বল্লেন, পাগলী মেয়ে ! সে আমায় ফেলে গেছে নাকি ! সে গেছে শিক্ষালাভ করতে। আমার সুধীর মত কটা ছেলে হয় বল দিকি। আমায় ভুলে সে কখনো থাকতে পারে ?

শেষের কথাটা সুপ্রভার ধরে এলো। একটু পরেই বল্লেন, কত কাজ ওর কোলকাতায়। লিখেছে বন্ধুরা ওকে অভিনন্দন জানাবে। সুধীকে কত লোকে সম্মান করবে, কত জায়গায় ওর নাম যশ হবে, এখানে ওকে আটকে রাখা অন্যায়।

একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তবু ও আসুক, ওখানে এখন বিপদের আশংকা !

স্যুটকেশ হাতে নিয়ে সুধীন এসে উঠতেই কাজলী ছুটে এসে বল্ল, দেখি স্যুটকেশটা, কি নিয়ে এলে আমাদের জন্যে দেখি।

সুধীন ধমক দিয়ে উঠল, হাত দিস না, অনেক দামী জিনিস আছে।

সুধীন স্যুটকেশ খুলতেই কাজলী দেখলো সমস্ত স্যুটকেশটা বইয়ে ঠাসা। মোটা মোটা ইংরেজী বই, বিচিত্র তার মলাট। অবাক হয়ে গেলো কাজলী : বাব্বা ! সুধীদা এঁতো বই পড়তে পারে ?

মুখে অবজ্ঞা দেখিয়ে সে বল্লে, মাগো, এসব বই আবার মানুষে পড়ে !

সুধীন জবাব দিল, ঠিক বলেছিস, এসব বই সাধারণ মানুষরা বিশেষ পড়ে না। যত সব ভূত, ব্রহ্মদৈত্য, মামদো এরাই এগুলির পাঠক।

সুধীনের কথা শুনে কাজলীর হাসি পেলো। তবু সে চুপ করে রইলো। সুধীন বল্লে, কোলকাতায় একদিন আমার সংগে একটা ভূতের দেখা! ভূতটা নমস্কার জানিয়ে বল্লে কি জানিস? বল্লে, যাঁবেন একদিন আঁমার ওঁখানে। গেলাম সেখানে। দেখি, যত ভালো ভালো বই ভূতটা সংগ্রহ করে বাড়ীতে একটা চমৎকার লাইব্রেরী বানিয়ে রেখেছে। এমনি মানুষ কাকেও দেখলাম না। দেখলুম আরো কত ভূতদের।

কাজলীর কৌতুক লাগলো।···ভূতরা কি বল্লে তোমায়?

—একজন ভূত আমায় দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে, আঁসুন সুঁধীন বাঁবু, বঁসুন। তাঁরপঁর সঁব ভাঁলো আঁছেন তোঁ?

অনুনাসিক সুরে বলতে বলতে সুধীন হেসে উঠলো, কাজলী আর থাকতে না পেরে সেও সে হাসিতে যোগ দিল।

সুধীন মাকে জিজ্ঞাসা করলো, এবার কি করবো মা? বি.এ টাতো শেষ হলো।

কি করবি বল্ তুই, সুপ্রভা বল্লেন।

আমার ইচ্ছে এম. এ টাও পড়া, না পড়লে ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে।

যা ভালো বুঝবি করবি। তোর কলেজ কবে শুরু হবে?

এখনো অনেক দেরী আছে, তিনমাস সময় আছে। এখন আর এখান থেকে নড়ছি না, কলেজ শুরু হলে ফের গিয়ে একেবারে এ্যাডমিশন নেবো। আমি চলে গেলে তোমার বড্ড কষ্ট হয় জানি, কিন্তু তোমাকে আরেকটু সহ্য করতেই হবে মা। জানো মা, মানুষের জীবনে পড়ার শেষ নেই। আমাকে অন্তত আরো একটু জানতে দাও। এম. এ টা না পড়লে আমার জীবনে ক্ষোভ থেকে যাবে।

সুপ্রভা বল্লেন, না, না, পড়া থামাস নি। পড়া থামালে ভাতাও যখন বন্ধ করে দেবে, তখন এম. এ টাও পড়। আমার কোনো কষ্ট নেই রে পাগল, তোকে সুখী দেখলে আমার সব দুঃখকষ্ট আনন্দ হয়ে ফুটে ওঠে।

সুধীনের চোখদুটি সজল হয়ে উঠলো। সুপ্রভা বল্লেন, এক এক সময় বড় একা মনে হয়। মনে হয় তুই যেন আমায় ভুলে গেছিস। হ্যাঁরে, তোর ওখানে কষ্ট হয় নাতো?

সুপ্রভা শুয়েছিলেন। সুধীন তাঁর পাশে বসে ছিল। সুপ্রভা তাঁর হাতখানি রাখলেন সুধীনের গায়ে। সুধীনের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন, এই এক বছর তুই আসিস নি। মায়ের কথা কি একটীবারও মনে ছিল না?

সুধীন লজ্জিত হয়ে উঠলো, বল্ল, ছুটিতে বড্ড খাটতুম মা, ফার্ষ্ট হবার জন্য সাধনা করতুম। তখন আমি কোনো কথা ভাবতুম না। সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে মা, আমায় ক্ষমা করো।

সুপ্রভা কিছু না বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লেন। সুধীন বলতে লাগলো, মাসীমাদের ওখান থেকে চলে যাবো ভাবছি। অসুবিধাও হয়। আর বড় অহংকার লাগে। সুধাদা বি. সি. এস পাশ করেছে। শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে ঢুকবে। বিনুও বি. সি. এস পড়বে। সে-তো আমার সংগে কথাই বলে না। মেশোমশাই দেখা হলেই সরকারের গুণগান করে নিমকের মর্যাদা রাখেন। বাবার কথা মাঝে মাঝে আলোচনা হয়—আমাকে শোনাবার জন্যেই মন্তব্য শানিয়ে ছোঁড়া হয়। অসহ্য লাগে আবহাওয়া। ওদের ঐশ্বর্যের গুমোট আমার দম বন্ধ করে দেয়।

গুম্ হয়ে শুনে যান সুপ্রভা। কিছু বলেন না। সুধীন বলতে থাকে, এবারে স্কলারসিপ বাড়বে, তোমাকে বেশী করে টাকা পাঠাতে পারবো। তোমাকে এবার থেকে কিছু বেশী না পাঠালে খুব অসুবিধা হবে বুঝি।

সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে বেশী টাকা পাঠাতে গিয়ে তোর ওদিকে কম পড়ে যাবে। তোর চলবে কি করে শুনি?

চল্‌বে মা, চল্‌বে, সুধীন হেসে বল্ল, চলাতেই হবে। এবং এখন থেকে রোজগারের পথও দেখতে হবে। শুধু পড়লে চলবে না, উপার্জনও করতে হবে আমায়। ট্যুশানি নেবো কিছু।

সুপ্রভা উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করলেন, পড়বিই বা কখন, পড়াবিই বা কখন? তা হয় না। অত খেটে শরীর নষ্ট করতে দিচ্ছি না আমি! আমায় বেশী টাকা পাঠাতে হবে না, বরং যা পাঠাস, তা থেকে কিছু কমিয়ে নিস। মাসীমাদের ওখান থেকে চলে যাবি বলছিলি, যাবি কোথায় শুনি? উঠবি তো কোনো মেসে, সেখানে শুনেছি ভালো খাওয়া দাওয়া হয় না, কেউ কাউকে চেনে না। তোর পড়াশুনারও তো ক্ষতি হতে পারে?

সে কথা সুধীনও ভাবছিল। মেসে নিরিবিলি অধ্যয়নের সুবিধা পেতে হলে নিতে হয় একটা আলাদা ঘর—এবং সেজন্য অল্প টাকার প্রয়োজন নয়। মাসীমা-দের বাড়ীর আবহাওয়াটা যতই বিরক্তিকর লাগুক না কেন, চিল-কুঠুরীতে এসে দরজা বন্ধ করে দিলে একটা শান্তিকর পরিবেশ গড়ে ওঠে। মাকে সে কিছু টাকা এবার থেকে বেশী পাঠাবেই। সুতরাং মেসে যাওয়ার পরিকল্পনাটা বাতিল।

কিন্তু ট্যুশানি তাকে নিতেই হবে। ভবিষ্যতের জন্যও তা প্রয়োজন।

দুপুরের দিকে সুপ্রভা গেলেন হিরণ্ময়ীর কাছে। মনটা আজ তাঁর অনেক হাল্‌কা। সেই পুরোনো দিন আবার ফিরে এসেছে। এই এক বছর মনের আকাশে ছিল ঘন কুয়াশা, আজ পর্বত হয়েছে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

দুপুরে কাজলী এলো।—সুধীদা, কি কর্চ্ছো?

গোলমাল করতে এলি! সুধীন সশব্দে বইটা বন্ধ করে রাখলো। বসতে বল্ল কাজলীকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁরে, মায়ের একা খুব কষ্ট হয়?

কষ্ট হয় না? একমাত্র ছেলে যার সারা বছরে একটীবারও আসতে পারে না, তার কষ্ট হয় না? তুমি কিন্তু ভারী নিষ্ঠুর সুধীদা—

হুঁম, গিন্নীর মত কথা কইতে শিখেছিস, সুধীন চোখ পাকিয়ে বল্ল, এম. এ

পড়তে যাবো। ছুটির সময় আসবো। এসে যদি শুনি মায়ের দেখাশোনা ভালো করে করিস না, তাহলে একেবারে খুন করে ফেলবো।

কাজলী চটে বল্ল, ইঃ! খুন করবে? করো না দেখি একবার। বিদ্যা-দিগ্গজ—খালি পড়তেই পারো, খুন করাটা পড়ার মত এত সহজ নয়!

কাজলীর রাগ দেখে সুধীন হাসলো। বল্ল, দূর পাগল! তোকে খুন করতে পারি কখনো? তোকে আমি কত ভালোবাসি, সত্যি খুব ভালোবাসি।

কাজলী এবার সুধীনের কাছে ঘেঁসে বসলো। বল্ল, কি ভীষণ বই পড়ো তুমি সুধীদা। হাইকোর্টের জজ না হয়ে তুমি ছাড়বে না।

সুধীন বল্ল, তুই বুঝি ভাবিস সুধীদা হাইকোর্টের জজ হবার জন্যে এত বই পড়ে? নারে, জজ-ব্যারিষ্টারীতে আমার লোভ নেই। আমি পড়ি শুধু জানতে—পৃথিবীকে জানতে, দেশকে জানতে, নিজের মন আর বুদ্ধিকে জানতে। বলে সে কাজলীর মুখের দিকে তাকালো।

কাজলী চুপ করে বসেছিল। সুধীন বল্লে, এ পড়ারও শেষ হবে একদিন। সে দিন আমি কি করবো জানি না, তবে এটুকু জানি আমাদের সমুখের চলার পথে যে কালো অন্ধকারের স্তর জমাট বেঁধে রয়েছে, তা দূর করার কাজে আমিই হবো একজন শ্রমিক। এসব তুই বুঝতে পারবি না কাজলী। পরে বুঝবি, আমিই তোকে বুঝিয়ে দেবো সেদিন।

কার্লমার্ক্সের "ক্যাপিটাল" বইটা খুলে সে পড়তে আরম্ভ করলো গভীর মনোযোগ সহকারে। কাজলী অধ্যয়নরত সুধীনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর কখন যে উঠে এলো তা সে টেরও পায় না।

সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে সুধীন এসে পড়লো হরিহরের দোকানের সামনে। অন্ধকার হয়ে এসেছে, কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে হরিহর একা বসেছিল চুপ করে।

সুধীনকে আসতে দেখে হরিহর ওকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে ডাকলো। সুধীন ভিতরে এসে বসতে বসতে বল্লে, কেউ নেই যে হরিকাকা ?

বলো কেন আর ? হরিহর উষ্মার সংগে বল্লে, বাকী বকেয়ার কারবার তুলে দিয়েছি, এ বাজারে আর বাকী ফেলে রাখা যায় না, কে আর এখন বসে গল্প করতে আসবে বলো ?

সুধীন জিজ্ঞাসা করলো, কি হলো তোমার হঠাৎ ?

হঠাৎ আর কি হলো, হরিহর ফেটে পড়লো সহসা, ধারে খেয়ে খেয়ে সব ল্যাজ মোটা হয়ে গেছে। কৃপাময় বিশ্বেস, রসিক সামন্ত, পরাণ মণ্ডল, নিধু কোবরেজ, কার নাম না করবো খুঁজে পাই না—তাগাদা করে করে হায়রান হয়ে গেলুম হে, সারা মাস বাকী ফেলে মাসকাবারেও কি কেউ উপুড় হাত হবেন ? সাফ বলে দিয়েছি মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে বাকী কারবার আমার চল্‌বে নি। এক হাতে দাও, আরেক হাতে নাও।

সুধীন হাসতে লাগলো। প্রসংগটা এড়াবার জন্যেই সে মন্তব্য না করে হাসতে লাগলো। সুধীনকে হাসতে দেখে হরিহর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, ব্যবসা করা কি কম ঝঞ্ঝাট ! বিশ বছর এই করে চুল পাকিয়ে ফেল্লুম। যাক, সে কথা। কেমন আছো তুমি সুধীন বাবু ? এবার নাকি ফাষ্টো হয়েছ শুনলুম।

হ্যাঁ, সুধীন জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি খবর পেলে কি করে ?

এসব খবর চাপা থাকে না গো, হরিহর দাঁত বার করে হেসে অন্তরংগ হবার প্রয়াস পেলো, হাওয়ায় চলে আসে। কোলকাতার কি খবর বলো ? বোমা পড়বে নাকি ?

পড়তেও পারে, তবে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। আমি তো ফের যাবো কোলকাতায়। এম-এ পড়তে।

হরিহর চিন্তিত মুখে বল্লে, এই সময়ে আবার যাবে সেখানে ? মা-ও কি যেতে দেবেন ?

মাকে রাজী করাতেই হবে, সুধীন বল্ল, এম-এ না পড়লে আমার অনেক কিছু পড়াই বাকী থেকে যাবে হরিকাকা। তাছাড়া, সেখানে বিশেষ ভয় কিছু নেই। লোকেই ভয় পেয়ে নানারকম গুজব ছড়াচ্ছে।

হঠাৎ হরিহরের মুখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। আকস্মিক প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা সুধীনবাবু, জাপানীরা রেংগুনটা ঠিক নিয়ে নেবে, না কি বলো?

তার গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে সুধীন জবাব দিল, কি জানি! তবে লড়াইটা খুব জোর হবে।

রেংগুন গেলে বাংলাও গেল, নয় কি? হরিহর বল্ল, এরা রুখতে পারবে বলে তো মনে হয় না। জমিদারী এবার গ্যালো এদের।

হরিহরের কাছে কিছুক্ষণ থেকে উঠে এলো সুধীন। হরিহরের বকবকামি ভালো লাগছিল না তার। তার প্রশ্নের অন্তর্নিহিত ইংগিতে, তার আলোচনার গতিতে একটা সংকীর্ণ স্বার্থের প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছিল। একটা ব্যবসাদারী দাঁও কষার মতলব ফুটে উঠছিল তার বাক্যের স্তূপে—সুধীন তা বুঝতে পেরেছিল। হরিহরের সংগ তাই বিস্বাদ লাগছিল তার। আসলে লোকটা ভালো নয়, সুধীন কিছুটা জানতোই, হরিহরের চেহারার বহিঃপ্রকাশেও কিছুটা বোঝা যেত। তার মুখের গড়নটা ক্রুর, চোখ দুটো ছোট ছোট। মুখের দুপাশে দুটি ধারালো দাঁত পংক্তি ছাড়িয়ে নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে—ঠিক শ্বদন্তের মত। কপালটা ছোট এবং চুল শুরু হয়েছে প্রায় ভুরুর উপর থেকে। সুধীন চলে গেলে হরিহর তামাক সাজতে বসলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তার তামাক খাওয়া চলবে। তার পর সে দোকান বন্ধ করবে।

নিধু কোবরেজের বাড়ীর সমুখ দিয়ে যেতে যেতে কি ভেবে সুধীন ভিতরে ঢুকে পড়লো। উঠানের পাশে চাঁচের বেড়া দেওয়া রান্নাঘরে বসে একটা মেয়ে রাঁধতে রাঁধতে মাঝারি গলার গান গাইছিল। কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তার শিখাটা বেশ দেখা যাচ্ছে, এক রাশ কালো ভূষো শিখা

থেকে উপরে আসছে। চঞ্চল ভূষোমাখা আলোয় মেয়েটীর মুখ আবছা দেখা যাচ্ছে। শ্যামল মুখ একটী, চুলগুলো ঘাড়ের কাছে ঘেমে উঠেছে। সুধীনের পায়ের শব্দে ফিরে তাকাতেই চমকিত হয়ে সে গান থামিয়ে ছুটে পালালো ভিতরে।

সুধীন উঠে এলো দাওয়ায়। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইন্দুমতী, নিধু কোবরেজের দ্বিতীয় পক্ষ। দুবছর আগে কোবরেজ তাকে বিয়ে করে আনে। ইন্দুমতীর বয়স তখন আঠারো কি উনিশ। কোবরেজের বয়স তখন কম করে পঞ্চাশ।

নিধু কোবরেজের যখন বিয়ে হয় দ্বিতীয়বার, সুধীন সে সময় গ্রামে এসেছিল। আগে নিধু দাওয়ায় বসে রুগী দেখতো, ওযুধ মেড়ে খাওয়াতো। রুগী বসাবার মত বাড়তি ঘর তার ছিল না। দাওয়ায় বসেই সে এতকাল কবিরাজী করে এসেছে। কিন্তু নোতুন বিয়ে করে কোবরেজের হলো মুস্কিল। রুগীরা এসে বসবে দাওয়ায়, আর তার অষ্টাদশী তরুণী স্ত্রী রান্নাঘর-উঠানে ঘুর ঘুর করে বেড়াবে, এটা তার মনঃপূত হলো না। ইন্দুমতীর আসার পর থেকেই কোবরেজের পসার কমতে আরম্ভ করলো।

রুগীদের বসাতে পারে না, পসার হবেই বা কেন ?

বউটার স্বভাব চরিত্র নাকি ভালো না। অন্তত লোকে তাই বলে। লজ্জা-সরমের বালাই নাকি নেই, যখন যেখানে ইচ্ছা হুট করে যায় আসে। একদিন, সেন-দীঘির ঘাটে স্নান সেরে আসার সময় দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে কাজল গাঁয়ের জমিদার-তনয়ের সংগে সে কথা কয়েছিল। কেউ ছিল না সে সময়। অথচ কথাটা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হতে বেশী দেরী হয় নি। কাজল গাঁয়ের জমিদারের মধ্যম পুত্র কোলকাতা থেকে এসেছে। পাখী শিকারের ভারী শখ। সেন-দীঘির পশ্চিম তীরে সন্ধ্যাবেলা অসংখ্য বালিহাঁস আর বকের মেলা বসে। ছেলেটা তাই বন্দুক নিয়ে চলে এসেছিল শিকার করতে।

বিশাল সেন-দীঘি। কবে কোনকালে এক জমিদার দীঘি নির্মাণ করেছিলেন, কত দিনের কথা সে। লম্বায় প্রায় আধ মাইল তো হবেই। দুই তীরে এখন জংগল বেড়ে উঠেছে, অনেকগুলি ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে। শালুক আর পদ্মে অনেক জায়গায় জল ঢেকে রয়েছে। কাঁকনতলার মেয়েরা যায় কাছের একটী ঘাটে। এখন আর সেটা ঘাট নেই, ভেঙে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এখন আঘাটা। সাবধানে নেমে ওরা কাজ সারে।

ওখান থেকে কিছু দূরে বউ ঠাকুরাণীর ঘাট। ভারী চমৎকার ঘাট, এখনো ভালো অবস্থায় রয়েছে। জমিদার হয়তো তাঁর পত্নীর জন্য তৈরী করেছিলেন এটী। এখনো পরীর মূর্তি দুটো ঠিক রয়েছে, একটীর একটী হাত যা নেই। জলটাও এখানে ভালো, পরিষ্কার টলটলে। ঘাটের ওপরেই একটা প্রকাণ্ড আম গাছ। দুপুরের দিক থেকেই তার সুনিবিড় ছায়াটা পড়ে জলে। বিকেলে জলটা থাকে তাই শীতল। নিধু কোবরেজের নোতুন বউ ইন্দুমতীর ভারী ভালো লাগে বউ ঠাকুরানীর ঘাটে অবগাহন করতে।

একাই সে চলে আসে ঘাটে, একাই চলে যায়! ভয়ও করে না একটু।

শাদা শাদা বক আর বালিহাঁসের দল মিছিল করেছে সেন-দীঘির পাড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে এগিয়ে আসছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে। গায়ে গায়ে নিবিড় হয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে বালিহাঁস আর বকগুলো। দূর থেকে দেখে মনে হয় কে যেন একটা শাদা আস্তরণ বিছিয়ে রেখেছে দীঘির পাড়ে। প্রশান্ত বন্দুক বাগিয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্য নলে চোখ রেখে পিছু হাঁটছিল। অবগাহন সেরে ফিরছিল ইন্দুমতী। প্রশান্ত পিছু হটতে হটতে একেবারে এসে পড়লো তার ঘাড়ে।

ইন্দুমতীকে দেখে সে অবাক। ইন্দুমতী পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। প্রশান্ত খপ করে তার হাতটা ধরে বল্লে, দাঁড়াও, তারপর বন্দুক ফেলে দিয়ে অন্য হাতে তার মুখের লম্বা ঘোমটা তুলে দিয়ে বল্লে, চলে গেলেই তো আর যাওয়া হয় না।

পথ ছাড়ুন, যেতে দিন আমায়, ইন্দুমতী ঝাঁঝের সংগে বল্ল।

হুঁম্! প্রশান্ত তার হাত ছেড়ে দিয়ে বল্ল, আমাকে আপনি বলতে কবে থেকে শিখ্‌লে ইন্দুমতী? কোলকাতা থাকার সময় তো বলতে না?

ইন্দুমতী জবাব দিল, বলতাম না, তার কারণ তখন আমরা আপনার পুতুল-খেলার অভ্যাসের পরিচয় পাই নি।

ইন্দুমতীর ক্রোধটা উপভোগ করে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলো, পরিচয় পেলে কবে?

ইন্দুমতী বল্ল, যেদিন প্রথম আপনি আমাদের বাড়ী থেকে আমার দেখা না পেয়ে চলে আসেন, তার কিছু আগে। সেদিনই আমি চলে যাই কালনায় দিদির শ্বশুর বাড়ী।

ও, আর সেখান থেকেই বুঝি তোমার বিয়ে হলো?

হ্যাঁ, বলে ইন্দুমতী আশে পাশে একবার চাইলো, তারপর বল্লে, এবার আমায় যেতে দিন। অন্ধকার হয়ে আসছে। আপনার পাখী শিকারেরও অসুবিধা হচ্ছে।

প্রশান্ত বল্ল, শিকার মন্দ হলো না ইন্দুমতী। এমন ভালো শিকার জুটবে আশা করি নি। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে প্রশান্ত বল্ল, ভাখো, ওই সেনহাটির ভাঙা কুঠি-বাড়ী আমরা কিনে নিয়েছি, ওর চাবি আমার পকেটে। আমাকে অসম্মান করলে তোমায় আমি ওখানে বন্দী করে রাখতে পারি জানো?

ইন্দুমতী প্রশান্তর মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো। যেন সে তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অবলোকন করে নিতে চাইলো। তারপর মৃদু হেসে বল্ল, তা তুমি পারো প্রশান্তদা, কিন্তু অসম্মান তো তুমিই আমায় কর্চ্ছো।

আর নয়, প্রশান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল, এখনো তুমি আমার হৃদয়ে ঝড় তোলো, তোমার কণ্ঠস্বর তোমার ভাষা এখনো আমার রক্তস্রোতে সংগীতের প্লাবন আনে, আনে আগ্নেয়-গিরির উত্তপ্ত কলরোল। সাহারার রুক্ষ সুর আমার সর্বাংগে ছড়িয়ে পড়ে। তবু তোমাকে আজ আমি সম্মান করবো ইন্দুমতী, এখন

আর তোমায় অসম্মান করতে হাত উঠছে না। একটা কথা বলি, আমাদের তো তুমি জানো। প্রয়োজন যদি হয় কোনোদিন জানাতে ভুলো না।

কাঁধের ওপর বন্দুক রেখে প্রশান্ত চল্ল ওর সাথে। পাশাপাশি কিছুদূর গেল দুজন। কত কথা মনে পড়তে লাগলো ইন্দুমতীর। কোলকাতার সেই বিকেল, সেই সন্ধ্যাগুলি! গরীবের মেয়ে ইন্দুমতী, কিন্তু প্রশান্তদার সংগে গল্পগুজবে কাটানো বিগত সুখের সন্ধ্যাগুলি! কত আশা ছিল তার, প্রশান্তই সব চূরমার করে দিল।

জমিদার-তনয়ের সংগে দরিদ্রার বিবাহ অসম্ভব বিলম্বে হলেও একথাটা তারা বুঝেছিল। ইন্দুমতী তার দিদির শ্বশুরবাড়ী কালনায় বেড়াতে চলে গেল।

সেন-দীঘির দুই তীরে জংগল। অতি সংকীর্ণ পায়ে হাঁটা পথ। বউ ঠাকুরাণীর ঘাট, আমের বন, বাঁশের ঝাড় পেরিয়ে ওরা পাশাপাশি অনেকদূর চলে এলো। ইন্দুমতী এক সময় বল্ল, আর নয়, এবার তুমি যাও, আমি একাই যেতে পারবো।

পাড়া এসে পড়েছে। ইন্দুমতী ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলো কাঁধের ওপর বন্দুক রেখে তার ওপর দুটী হাত আটকে দেওয়া প্রশান্তর ঋজু সুঠাম দেহ ধীরে ধীরে দীঘির পাড়ের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেই একদিন। এর পর বহুদিন বউ ঠাকুরাণীর ঘাটে একা গেছে ইন্দুমতী, একদিনও প্রশান্তর সংগে তার দেখা হয় নি। একদিনই যথেষ্ট, একদিনের দেখাতেই নানা লোকে নানা কথা বলতে লাগলো, কেউ হয়তো লক্ষ্য করেছিল সে সময়।

সে সব গ্রাহ্যও করে না ইন্দুমতী, কোলকাতার মেয়ে সে।

দাওয়ায় মাদুর পেতে সুধীনকে বসতে দিল ইন্দুমতী। সে-ও বসলো পাশে। নিধু কোবরেজ কোথায় গেছে। ইন্দুমতী প্রাণ খুলে গল্প করতে লাগলো। সহজ সরল মনটা, সুধীনের ভালো লাগে এই ধরণের মন। কোলকাতার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাদের বাড়ীর কথা—

ইন্দুমতী বল্লে, কি যে সব হবে, বাবার জন্যে বড্ড ভাবি। বুড়ো মানুষ, এখনো আপিস করেন, এই সব বিপদের দিনে—

না-না, সুধীন আশ্বাস দেয়, খুব ভয় নেই সেখানে। লোকে অকারণে ভয় পাচ্ছে এতটা, আমি তো আবার যাবো সেখানে।

পড়তে? সহজ স্বরে প্রশ্ন করে ইন্দুমতী। সুধীন ফের কোলকাতায় যাবে—কথাটা তাকে আশ্বাস দেয়। বাবার জন্যে দুশ্চিন্তা কিছুটা হালকা হয়ে যায়।

হুঁ।

রান্নাঘরে কেউ নেই। উনুনে তরকারী চাপিয়ে রেখেই ইন্দুমতীর বোন ছুটে পালিয়ে এসেছে ঘরে। একটা বিশ্রী গন্ধ বার করে তরকারীটা পুড়ে যায়। ইন্দুমতী চীৎকার করে বলে, এই মুখপুড়ী, তরকারীটা পুড়ে গেলো যে—

তুই দেখ না দিদি, ঘর থেকে জবাব আসে।

ইন্দুমতী রান্নাঘরে উঠে গিয়ে কড়ায় খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে আসে। তারপর ঘরের মধ্যে থেকে টানতে টানতে মেয়েটাকে বার করে সুধীনের সামনে এনে হাজির করে। ইন্দুমতী বলে, লজ্জা অত? তুই না আমার বোন, কোলকাতার মেয়ে। ইনি হলেন আমাদের সুধীন রায়। এবারে বি-এতে ফার্ষ্ট হয়েছেন।

সুধীনকে বলে, আর এ আমার বোন সুমিত্রা। ভারী ভালো মেয়ে। গেল কার্তিক মাসে এসেছে। ভালো লাগে না এখানে, কথা কয়ে সুখ পাই না কারু সংগে, তাইতে আনলাম ওকে। ওর একটি খুব ভালো কোয়ালিফিকেশন আছে জানেন সুধীনবাবু, খুব ভালো গান গাইতে পারে।

সুধীন মুখ টিপে হেসে বল্লে, আমি ওঁর গান একটু আগেই শুনে ফেলেছি।

লজ্জায় জড়সড় হয়ে উঠেছিল সুমিত্রা। মেয়েটী একটু লাজুক। সুধীনের নাম সে শুনেছে এখানে এসে, দিদির সংগে কয়েকবার গিয়েছেও সুধীনের মায়ের কাছে। ইন্দুমতীর মত সে অত মুখরা নয়।

ইন্দুমতী বল্ল, স্থমিত্রা ভালো 'আবৃত্তি করতে পারে, ওর আবৃত্তি শুনলে আপনি মুভ্ড হবেন নিশ্চয়ই। কদ্দুর পড়েছে জানেন ?

ইন্দুমতীর বাবার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তিনটী মেয়ে তাঁর—ছেলে একটীও নেই। মেজ ও ছোট মেয়েকে তিনি পুত্রের মত মানুষ করেছিলেন। দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, যথেচ্ছ স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন। ইন্দুমতী পড়েছিল ম্যাট্রিক পর্যন্ত, পরীক্ষা দেয় নি। আর স্থমিত্রা ইণ্টারমিডিয়েট ফার্ষ্ট ইয়ার পর্যন্ত পড়েছে।

বোনের প্রশংসায় ইন্দুমতী প্রগল্ভ হয়ে উঠলো—রাঁধতেও পারে চমৎকার। দেখবেন ? বলে ছুটে গেল সে। স্থমিত্রা দিদির পিছু পিছু গিয়ে বল্ল, কি পাগল তুই দিদি! আমার হাতের রান্নার পরিচয় ওঁকে না-ই বা দিলি।

দিলেই বা, ইন্দুমতী প্রতিবাদ করে বল্ল, লজ্জার কি আছে ? ভালো ছেলেকে যদি খুশি করতে যাই, কুণ্ঠার কি আছে শুনি ?

খান তো দেখি, ইন্দুমতী স্থধীনের হাতে একটা ডিশ দিয়ে বল্লে, পুডিং তৈরী করেছে স্থমিত্রা। খুব ভালো অবশ্য হয় নি, ভালো জিনিষ যে মেলে না এখানে।

স্থধীন খেতে খেতে বল্লে, চমৎকার হয়েছে। ভালো জিনিষ মেলে না, তাইতেই এমন হয়েছে, আপনার বোনের রান্না খুব ভালো তো!

ইন্দুমতী হাসলো। স্থমিত্রার দিকে চেয়ে বল্ল, বি-এ ফার্ষ্ট ছাত্র তোকে সার্টিফিকেট দিল স্থমিত্রা। এ তোর ভাগ্যি।

লজ্জারক্তিম মুখে স্থমিত্রা বল্ল, ও আমি চাই না, ও আপনি ফিরিয়ে নিন স্থধীন বাবু।

ফিরিয়ে নেবার কথাটা আকস্মিক বেরিয়ে গেল স্থমিত্রার মুখ থেকে। সে একরকম ছুটে চলে গেল ভিতরে।

যাবার সময় ইন্দুমতী বল্ল, এখানে আপনার রোজ নিমন্ত্রণ রইলো স্থধীনবাবু। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না কিন্তু। আসবেন।

—দুই—

কোলকাতায় এসে সুধীনকে বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। প্রদীপ ধরে বসলো তার বোন সুবর্ণকে পড়াতে হবে। সুবর্ণ ইণ্টারমিডিয়েট দেবে এবার।

অফারটা মন্দ নয়। সুবর্ণরা ওকে শুধু রাত্রে একবেলা ট্যুশানির জন্যই দিতে চাইলো তিরিশ টাকা। ট্যুশানির টাকাটার সংগে স্কলারসিপের অংকটা যোগ করলে মন্দ হবে না।

বেঁচে গেল সে। মাকে মাসে মাসে কিছু পাঠাতে পারবে। নাহলে মায়ের অসুবিধা হবেই। দিন দিন সমস্ত জিনিসের দাম যা চড়ে যাচ্ছে।

নিজের অধ্যয়নের সময় কিছুটা কমে গেল, কিন্তু সেজন্য সে দুঃখিত নয়। পরিশ্রমটা একটু বেড়ে গেল এই যা। আর সুবর্ণ যদি বুদ্ধিমতী হয় তো ট্যুশানির ফাঁকে ফাঁকেই সে তার নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে।

সৌভাগ্যের বিষয় সুবর্ণ বেশ বুদ্ধিমতী বলেই আবিষ্কৃত হলো তার কাছে। ভারী আশ্বস্ত হলো সুধীন। বাঁচালো মেয়েটা। বুঝবার সময় সে মনোযোগ দিয়ে সব বুঝে নেবার চেষ্টা করে ও বুঝে নেয়।

ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। বিকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সন্ধ্যার সময় সুধীন মাথায় রুমাল চাপা দিয়েই ছুটে চলে এলো সুবর্ণদের বাড়ী। এটুকু আসতে গিয়েই তার সর্বাংগ ভিজে গেল। মাথা মুছতে মুছতে সে সোজা এসে ঢুকলো সুবর্ণর পড়ার ঘরে।

ভারী সুরম্য সুবর্ণর পড়ার ঘরটী। একেবারে উপরে এক কোণের ঘর। বড় বড় কাচের জানলা। প্লাইউডের সিলিং। সুবর্ণ জানলার কাচ টেনে দিয়ে টেবিলের এক পাশে বসে একখানা বই পড়ছিল। বাইরে ঝম ঝম করে জল পড়ছে। আকাশের আলো নিভে এসেছে। ছোট্ট টেবিল-ল্যাম্পটী কাছের গোড়ায় টেনে সুবর্ণ পড়ছিল একমনে।

সুধীন ভিজে মাথা ভিজে জামা জুতো নিয়ে ঢুকলো ঘরে। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। ভিজে রুমাল নিংড়ে তাই দিয়ে মাথা মুছবার প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় টপ্‌টপ্ করে জল ঝরে পড়ছিল মাথা থেকে। সুবর্ণ তাড়াতাড়ি উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বল্লে, একি ভিজে এলেন ?

কি করি বলো, বৃষ্টি আমার বন্ধু নয়, সুধীন জবাব দিল।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, ছাতা নিয়ে আসতে পারতেন তো, এমনি ভিজে আসবেন তাই বলে ?

সুধীন হেসে বল্ল, ছাতা আমার নেই, রেইন কোটও নেই, সুতরাং বৃষ্টিতে ভিজা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কর্তব্যে অবহেলা তো করতে পারি না।

সুবর্ণ একটা তোয়ালে এনে দিল সুধীনের হাতে। —নিন, মাথাটা মুছে ফেলুন, চশমাটা দিন আমার হাতে। কাচে এক পুরু জল জমেছে। আশ্চর্য লোক আপনি মাষ্টার মশাই।

সুবর্ণের কথা শুনে সে হেসে ফেল্ল। সুবর্ণ প্রশ্ন করলো, হাসলেন যে বড়ো ?

হাসবো না ? হাস্যকর সম্বোধনে লোকে কাঁদে নাকি ? তোয়ালেটা ফেরৎ দিয়ে সুধীন বল্ল।

মাষ্টার মশাই নামটা বুঝি আপনার পছন্দ হলো না ?

স্বধীন বল্লে, হলো না তো। কেমন একটা বার্ধক্য মেশানো রয়েছে নামটায়। সে কথা যাক, এই বাদলে এক কাপ চা হলে কিন্তু বেশ হতো।

আচ্ছা, আপনি বসুন, বলে স্বর্ণ চা আনতে ছুটলো।

চায়ের বদলে কফি এনে হাজির করলো স্বর্ণ। কফিতে চুমুক দিতে দিতে স্বধীন বল্ল, কি বই পড়ছিলে অত মনোযোগ দিয়ে ?

স্বর্ণের কাছে হপকিন্সের একটা পুরোনো কবিতার বই দেখে স্বধীন জিজ্ঞাসা করলো, কাব্য তোমার ভালো লাগে স্বর্ণ ?

স্বর্ণ জবাব দিল, কাব্য আমার খুবই প্রিয়। কিন্তু হপকিন্সের কবিতাগুলি ভালো হলেও বড্ড পুরোণো লাগে, নয় কি ?

—হ্যাঁ, ভিক্টোরীয় যুগের কবি উনি। য়ুরোপের নোতুন কবিতা কিছু পেয়েছ ?

স্বর্ণ বল্লে, পাচ্ছি কই ? এটা দাদার টেবিলে পড়েছিল, তাই এনে পড়ছি। কিছু এনে দিন না আপনি।

স্বধীন আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগলো :

You are the town and we are the clock,
We are the guardians of the gate in the rock,
The two.
On your left and on your right
In the day and in the night,
We are watching you.

—কেমন লাগলো ?

—বেশ মজার তো, স্বর্ণ বল্লে।

Wiser not to ask just what has occured

To them who disobeyed our word ;
To those
We were the whirlpool, we were the reef,
We were the formal nightmare, grief
And the unlucky rose.

স্থধীনের স্থন্দর আবৃত্তি ভংগীমায় স্থবর্ণ মুগ্ধ হয়ে গেল :

Climb up the crane, learn the sailor's words
When the ships from the islands laden with birds
Come in.
Tell your stories of fishing and other men's wives :
The expansive moments of constricted lives
In the lighted inn.
But do not imagine we do not know
Nor that what you hide with such care won't show
At a glance.
Nothing is done, nothing is said,
But don't make the mistake of believing us dead :
I shouldn't dance.

We are afraid in that case you will have a fall,
We've been watching you over the garden wall
For hours.
The sky is darkening like a stain,

Some thing is going to fall like rain
But it won't be flowers.

When the green field comes off like a lid
Revealing what was much better hid
Unpleasant.
And look, behind ycu without a sound
The woods have come up and are standing round
In deadly crescent.

The bolt is sliding in its groove,
Outside the window is the black removers'-van.
And now with sudden swift emergence
Come the woman in dark glasses and humpbacked surgeons
And the Scissor man.

সুধীন এতদূর আবৃত্তি করে সুবর্ণর দিকে সকৌতুকে আঙুল তুলে শাসনের ভংগীতে বলতে লাগলো :

This might happen any day
So be careful what you say
Or do.
Be clean, be tidy, oil the lock ;
Trim the garden, wind the clock
Remember the two.

আবৃত্তি শেষ হলে সুবর্ণ বল্ল, ভারী মজার কবিতা তো। য়ুরোপের মডার্ণ পোয়েট্রি আমার কিছু জানা নেই। বলুন না আর একটা।

বর্ষণবেগ কমে এসেছে। বাদল সন্ধ্যার দীপ্তিহীন আকাশে একটানা মন্থর ছন্দে গান গেয়ে চলেছে বৃষ্টি। স্থবর্ণ ওর অতি কাছে নিবিড় হয়ে হাসিমুখে বসে আছে কবিতার প্রত্যাশায়। আলো এসে পড়েছে তার সর্বাংগে, মুখে। আজ এত ভাল দেখাচ্ছে স্থবর্ণকে! আর তার ওরকম হাসিও পৃথিবীতে দুর্লভ।

স্থধীনের সৌন্দর্যপিপাস্থ মনে স্থবর্ণ একটা অনুভূতির ঝংকার তুল্ল।

ভালো লাগে তার ওরকম সবাইকেই। কাঁকনতলায় আছে কাজলী। চঞ্চলা হরিণীর মত সে ঘরে ঢোকে, আবার ফাল্গুন শেষের প্রথম চৈত্রের ঝরাপাতা দিনের এলোমেলো বাতাসের মতই কখন হুস করে চলে যায়। কথায় কথায় রাগ করে, ঠোঁট ফুলোয়। স্থধীনের উপর জোর ফলায়, অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করে। স্থধীনের ইতিহাসের গল্পে তন্ময় হয়ে ডুবে যায়। তারপর ইন্দুমতী— তাকেও দেখলো সে। ভয়ানক চালাক মেয়ে। প্রাণের রসে ভরপূর একটা জৈব চাঞ্চল্য তার সমস্ত দেহে-মনে—কাছের মানুষ সে চাঞ্চল্যের স্পর্শ পায়। হাতুড়ে চিকিৎসক নিধু কোবরেজের বউ হয়ে সে যখন মাঝে মাঝে ইণ্টেলেকচুয়েল আলাপ করে, অবাক বোধ হয় তার। তার বোন স্থমিত্রা, লাজুক অথচ মিষ্টি। একটী ভেজা জুঁইয়ের সাথে তার তুলনা। কি চমৎকার গুন গুন করে গান গায়। লেখাপড়া সে-ও করেছে, তবু পল্লীগ্রামে এসে দিদির মত সে-ও কেমন স্থন্দর ভাবে নিজেকে বদলে নিয়েছে। অন্ধকারে চাঁচের বেড়া দেওয়া রান্নাঘরে ভূষোওঠা কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে সে রান্না করে।

আর এই স্থবর্ণ—স্থবর্ণের মতই তার সোনার রং। তার মনেও হয়তো বা এই রং। গভীর টানা ভ্রূ, গাঢ় কালো চোখ, যেন স্তব্ধ গভীর জলাশয়ের বুকে দুটী পদ্মপাতা। রহস্যঘন। আর পক্ষ দুটী যেন ভ্রমরের পাখা। স্থবর্ণ যখন তাকায়, তখন মনে হয় জলাশয়ের স্তব্ধ গভীরতায় বুঝি আন্দোলনের ইশারা উঠেছে, সেই দৃষ্টির গভীরতায় ডুবে যেতে ইচ্ছা করে। অপরূপ এ দৃষ্টি।

—একটা রিয়েলিষ্টিক কবিতা শোনাই, এলিয়টের কবিতা, বলে স্থধীন শুরু করলো :

Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.
I was neither at the hot gates
Nor fought in the warm rain
Nor knee deep in the salt marsh, heaving a cutlass,
Bitten by flies, fought.

—থাকগে, ওসব রিয়েলিজমে তোমার কাজ নেই স্থবর্ণ, এসো পড়া দাও।

স্থবর্ণ বল্লে, বাঃ, বেশ লাগছিল আপনার আবৃত্তি। ভারী স্থন্দর আপনার উচ্চারণ।

স্থধীন জবাব দিল, আরো আবৃত্তি করতে পারি, কিন্তু গন্থ কবিতা আমার তেমন মনে থাকে না।

স্থবর্ণ বল্লে, আপনার কবিতাগুলিও কিন্তু অপূর্ব। সেদিন যেটা বেরুলো—

—কোনটা? বলো তো শুনি।

—অপরাজিতায় এমাসে যেটা বেরিয়েছে। আপনার কবিতা আমার মনে থাকবে কি করে?

স্থধীন জোর দিয়ে বল্ল, খুব থাকবে জানি। তার প্রমাণ পর্যন্ত পেয়েছি। তোমরা যেদিন আমায় সম্বর্ধনা করেছিলে, সেদিন কোন কবিতাটা মুখস্থ বলছিলে মনে নেই?

—ভালো কবিতা সহজেই মনে গাঁথা হয়ে যায়, স্থবর্ণ সরে এসে বসলো, আজ পড়া বন্ধ। এখন শুধু আপনার গল্প।

স্থধীন বাহিরের পানে তাকালো। কাচের বাইরে অবিরাম ধারায় জল পড়ছে। বল্ল, কি গল্প করবো স্থবর্ণ, গল্প আমার একটাই। সে তো অনেক শুনেছো।

—তবু বলুন আরো, শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। আপনার জীবনের বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ পাই।

সুধীন বল্ল, সেদিন আমাদের রঘুকাকার সংগে দেখা হয়ে গেল। আমাদের গাঁয়ের লোক। ভালোমানুষ, শান্ত শিষ্ট মানুষটা। বহুদিন গ্রামছাড়া। একেবারে বদলে গিয়েছে লোকটা। প্রথমটা চিনতে পারিনি, সে-ই ডেকে পরিচয় দিলে। চেনবার উপায় নেই এমনি অবস্থা ওর শরীরের। গ্রামে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ছিল। জমিজমা বিশেষ কিছুই ছিল না, পরের ক্ষেতে জনমজুরী করতো। জমিদারের কাছে কিছু কর্জ ছিল, সেই পাপে একদিন তাকে তার মাথা গোঁজবার ছোট্ট আশ্রয়টি ছেড়ে পথে বেরুতে হলো। সেই থেকে সে গ্রামছাড়া। এমনিতে স্বাস্থ্য ভালোই ছিল রঘুকাকার। যাহোক ক্ষুদকুড়ো খেতে পেতো গ্রামে। শহরে এসে এমন হাল হয়েছে তার চিনতে পারি নি।

সুবর্ণ বল্লে, চিনতে পারলেন না?

না, কারণ শহরে এসে রঘুকাকার পুরোনো দিনের সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। জোর করে তার সংগে গেলাম যেখানে সে থাকে। ভারী কৌতূহল বোধ করেছিলাম, যে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে অসত্যকে কোনোদিন আশ্রয় করে নি, আজ কি ভাবে তার দিন কাটছে, তার শেষ পর্যায় কোথায় এসে নেমেছে।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, গিয়ে কি দেখলেন?

দেখলাম অন্ধকার সংকীর্ণ একটা গলিতে তাদের বাস। নোংরা অস্বাস্থ্যকর পংকিল আবহাওয়া। বাতাসে দুর্গন্ধ। দুপাশে ছোট ছোট খোলার ঘর। পাশাপাশি। মাটির দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। আবাসের মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে। অধিবাসীরা নিম্নশ্রেণীর, যাদের আমরা ঘৃণা করি, যাদের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের সযত্নে বাঁচিয়ে চলি। যাদের নিঃশ্বাস বিষাক্ত, দৃষ্টিতে কলুষ, বাক্য মলিন ও কদর্য, ব্যবহার অমার্জিত ও বর্বর, রুচিতে বিকার, শরীরে অস্বাস্থ্য, আবাসে আবর্জনা। যাদের পৃথিবী ছোট, পরিধি সসীম, আকাশ ধূসর ও সংকীর্ণ। জীবনে যাদের স্বপ্ন

নেই, রং নেই, প্রেম নেই। প্রতি পলে দারিদ্র্য আর ভয়াবহ মৃত্যুর সংগে অতি দুর্বল যুদ্ধ করে যারা হাস্যকর ভাবে পরমায়ু বাড়াতে চায়, তাদেরই মাঝে ওই জঘন্য বস্তিতে একটা অন্ধকার পায়রার খোপের মত ঘরে বাস করে আমাদের গাঁয়ের সুস্থ সৎ মানুষ আজকের দিনের মুমূর্ষু রঘুকাকা। তার নীচু ঘরে যখন ঘাড় নুইয়ে ঢুকলাম—

বলতে বলতে সুধীন হঠাৎ স্বর্ণর মুখের পানে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে কথা বন্ধ করলো।

—তখন কি ?

সুধীন জবাব দিল, তখন এমন একটা দুর্গন্ধ নাকে এলো যে তুমি সেখানে থাকলে ঠিক মরে যেতে।

সুধীনের কথার আকস্মিক গতিপরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে স্বর্ণ তাকালো তার গাম্ভীর্যমাখা কঠিন দৃষ্টির পানে। তারপর বল্লে, থাক আপনার রঘুকাকার গল্প, বলে উঠে গিয়ে একটী ছাতা ও রেইন-কোট এনে দিয়ে বল্ল, আজ আর আমি পড়বো না।

স্বর্ণের কথা শুনে সুধীন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জিনিষদুটী প্রত্যর্পণ করে বল্লে, ওগুলোর দরকার হবে না। এ বৃষ্টিতে আমি ঠিকই যেতে পারবো।

তাড়াতাড়ি নেমে এসে সে বৃষ্টিবাদলের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

পরদিন পড়াতে এসে সুধীন বল্ল, আমি ভেবে দেখলাম স্বর্ণ, তোমায় আমার পড়ানো হবে না। অবশ্য এতে আমার আর্থিক অসুবিধা হবে একটু।

কেন ? স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করলো।

সুধীন বল্লে, ধনীর মেয়ে তুমি, দরিদ্র হলেও আমি তোমার শিক্ষক। তোমার খেয়াল-খুশিকে শ্রদ্ধা করে চলতে পারি না।

কি হলো আপনার, স্বর্ণ অবাক হলো একটু, আমার ওপর এত আক্রোশের কারণটা কি বলুন।

—কাল পড়তে চাইলে না, আজও হয়তো বসে গল্প করবে, আগামী কাল শরীর খারাপ হওয়ার ওজর দেখাবে, তোমার খেয়াল-খুশিমত আমাকে পড়িয়ে যেতে হবে। এমনি করে পড়া হয় না, পড়ানোও যায় না। আমারও সময় নষ্ট।

সুধীনের কথা শুনে স্বর্ণ হাসলো। বল্ল, সত্যি রাগ করেছেন তাহলে? আমার ওপর আপনার রাগ হয়? কিন্তু আমার মত এমন উৎসুক শ্রোতা আর কোথাও কি পাবেন?

সুধীনকে হাত ধরে বসিয়ে দিল সে।—নিন, আর রাগ করতে হবে না। রাগ করলে আমিও আপনার ওপর রাগ করতে জানি।

সুধীন স্বর্ণর দুষ্টুমীতে হেসে ফেল্ল। ·বল্ল, তুমি একটী ষ্ট্রেঞ্জ গার্ল।

চায়ের কেটলী নিয়ে এলো স্বর্ণ। সুধীনের জন্য এক পেয়ালা ঢেলে নিজের জন্য এক পাত্র নিলো। দুধ চিনি মিশিয়ে দেবার পর বল্ল, আজও আমার পড়া হবে না সুধীনবাবু।

তা হয় না, সুধীন উত্তেজিত হয়ে বল্ল, এই কদিন ধরে দেখছি তুমি মোটে পড়ছো না, খালি গল্প করো বসে বসে। তোমায় গল্প শেখাবার জন্য আমি আসি না তা তুমি জানোই।

স্বর্ণ মিটি মিটি হাসতে হাসতে জবাব দিল, তা জানি, কিন্তু লেখকদের নিজের মুখ থেকে গল্প শোনার লোভ দমন করা অতি কঠিন জানেন বোধ হয়। আজ একটু তাড়াতাড়ি এসেছেন চলুন, চা খেয়ে আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবেন। আমি মাকে বলে রাজী করে আসি।

সুধীনের সম্মতির প্রত্যাশা না করেই সে নীচে নেমে গেল।

বাধ্য হয়ে সুধীনকে যেতে হলো সিনেমায়। জীবনে এই তার প্রথম সিনেমা দেখা। এর আগে সে সিনেমা দেখে নি উৎসাহের অভাবে। চৌরংগীতে এক

জায়গায় একটী বিখ্যাত ইংরাজী ফিল্ম 'দেখানো হচ্ছিল। সুবর্ণ ড্রাইভারকে সেখানে যেতে নির্দেশ দিল।

গাড়ীতে পাশাপাশি বসে সুধীন সুবর্ণকে বল্লে, তুমি আমাকে যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স করেছো সুবর্ণ, নইলে রাজী হলাম কি করে? কিন্তু আমি ভাবছি আমার পরিচিত কেউ তাদের এই বুর্জোয়া-বিরোধী লেখককে মোটর বিহার করতে দেখলে কি ভাববে।

সুবর্ণ বল্লে, ভাবে তো মর্মান্তিকটাই ভাববে।

—তুমি ঠাট্টা করবে জানি, আমাদের সম্পর্কে তুমি কতটুকুই বা জানো সুধীন আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে বল্ল।

অভিমানাহত স্বরে সুবর্ণ বল্লে, বেশী জানি কিনা জানি না, তবে আপনার দুঃখ আপনার বেদনাবোধ আমাকে অল্প দুঃখ দেয় না। শ্রেণী-সংগ্রামের কথা আমি জানি না, তবে আপনার চেয়ে আমার অনুভূতি বোধ হয় খুব বেশী পৃথক নয়।

সুবর্ণর কথা শুনে সুধীন বিস্ময়াপন্ন হলো। সুবর্ণর মনের এই দিকটা তার কাছে চাপা ছিল এত দিন। সে ভাবতেও পারে নি সুবর্ণ তারই অনুভূতির সংগে মিলিয়ে নিজের অনুভূতি গড়ে তুলছে। তবু সে বল্ল, কিন্তু আমার অনুভূতি যে বড় বিচিত্র। আমার ধারণায় মানুষের সমাজে দুটী শ্রেণী। ধনী-দরিদ্রের সেই পুরোনো প্রশ্নটা। তুমি হলে ঐশ্বর্য-পালিতা রাজকন্যা। আমার মত দুঃখাশ্রয়ী মানুষের জীবনের বেদনাবোধ তোমার কাছে আজ নগণ্য বিলাস ছাড়া আর কি? তুমি পারো বাস্তবের রূঢ় রথচক্রতলে নিজেকে নিষ্পিষ্ট করতে, মাসের পর মাস অর্ধাহারে থাকতে? তুমি পারো অন্ধকার চিলকুঠুরীতে বছরের পর বছর অধ্যয়ন করতে, সর্বমানবের হৃদয় জয় করবার জন্য পারো তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে?

সুধীনের শেষের দিকের উত্তেজনাপ্রসূত প্রশ্নাবেগে সুবর্ণকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত

দেখা গেল না। শান্ত কণ্ঠে বল্ল, পারি, সে শক্তি আমার আছে। বিশ্বাস না হয়, পরখ করো।

হৃদয়ের অন্তর্লোকের গভীর বিশ্বাস ও শক্তি নিয়ে স্থবর্ণ কথাকটী উচ্চারণ করলো এবং সুধীনকে স্তব্ধ করে দিল।

শো ভাঙার পর সুধীন গাড়ীর দিকে এগোচ্ছিল, সুবর্ণ বাধা দিয়ে বল্ল, চলুন, মাঠে গিয়ে বসা যাক একটু। বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

সুধীন বল্লে, চলো।

অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত। অন্ধকার নেমে এসেছে ময়দানে। ওদের দুজনের মাথার উপর রাত্রির ঘনীভূত অন্ধকার। হাওয়া বইছে এলোমেলো। অদূরে চৌরংগীর আলোগুলো অবগুণ্ঠনে ঢাকা। মাঝে মাঝে এক একটা ট্রাম চলে যায় তীব্র গতিতে অন্ধকার ভেদ করে। তাদের গতির তীব্র ধাতব ধ্বনি কিছুক্ষণের জন্য নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে দেয়। এই অন্ধকার এই নৈঃশব্দ্য, ক্ষণিক কোলাহল—ময়দানের অসীম শূন্যতাময় বিরাট প্রান্তরে এক রহস্যময় সংকেত সৃজন করেছে। সুধীন নিস্তব্ধ, সুবর্ণ নির্বাক। দুজনে দুজনকে এমন পরিবেশে এত কাছে কোনোদিনও পায় নি।

ফিল্মটা দুজনকেই মুগ্ধ করেছিল। একটী লোকের জীবনেতিহাসের চলচ্চিত্র। দুঃখ-দারিদ্র্য ভাঙা-গড়া বিপর্যয় অতিক্রম করে সে গড়ে তুল্ল একটী বিরাট পরিবার, এক সুখ সম্পদে ভরা গৃহস্থালি। এক অনুর্বর উষর প্রান্তরকে ভেঙে চুরে সে রূপ দিলে এক সুন্দর শস্যপ্রসূ মৃত্তিকায়। রাষ্ট্রিক বিপর্যয়, পারিবারিক দুর্ঘটনা—কিছুই তাকে দমাতে পারলো না। তারপর বহুদিন পরে পৃথিবীর বহুসুখ অকুণ্ঠভাবে ভোগ করার পর পরিণত বয়সে ওই কৃতী পুরুষের মৃত্যু হয়।

কেমন লাগলো বইটা? সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলো।

সুধীন জবাব দিল, ভালোই, অমন সুখী জীবন সবারই কাম্য, আমারও। মনে হয় আমি এক বৃহৎ সংসার গড়ে তুলবো আমার পরিশ্রম দিয়ে, আমার চারপাশে মিছিল করে থাকবে অগণ্য সংখ্যাহীন মানুষ। সেই বৃহৎ জনস্রোতে স্বার্থ ঈর্ষ্যা দ্বন্দ্বের কোলাহল থাকবে না, থাকবে শুধু আনন্দ, থাকবে মানুষের মহৎ আদর্শ, আর থাকবে তুমি আমার পাশে আমার প্রেরণা হয়ে। কিন্তু সে শুধু স্বপ্ন, শুধু কামনা, আর কিছু নয়।

স্বপ্নাহতের মত সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, স্বপ্ন কি বাস্তব হয় না?

—হয়, কিন্তু বাস্তব আসে সংঘাতের ঘূর্ণাবর্তে। ঝড়ের কালো রাতে সংশয়ের দুর্যোগে হয় তো তুমি-ই হারিয়ে যাবে। আমার আদর্শ তোমাদের পরিবার বিরোধী। যে কারণে আজ আমি মাসীমাদের কাছে অপ্রিয়, সেই কারণে আজ তোমার বাবা মার কাছেও তো প্রিয় না হতে পারি। তোমাকে পাওয়া তাই আমারও দুরাশা।

সুবর্ণ চুপ করেছিল, সুধীন বলতে লাগলো, অর্থের সাথে ঐশ্বর্যের সাথে মিতালী আমার কোনোদিনও হবে না। ঐশ্বর্যবানদের চল্‌তি অর্থনীতিটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারি না। তোমাদের সংসারে আজ আমার স্থান শিক্ষক হিসাবে, শিক্ষাদানের পরিশ্রমের বিনিময়ে মূল্য নিচ্ছি মাত্র। তোমাদের পরিবারে আমার স্নেহের স্থান যেটুকু তা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আর প্রদীপের সহপাঠী বলে। শোনা যাচ্ছে, কংগ্রেসের আন্দোলন শীঘ্রি শুরু হবে, নির্দেশের প্রতীক্ষা করছি। নির্দেশ এলে আমাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেদিন তোমরা বা মাসীমারা আমায় ক্ষমা করতে পারবে কি? মেসোমশাই এরি মধ্যে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন। তিনি ঠিকই বিশ্বাস করেন রাজনীতিতে আমি বিপ্লবপন্থী। আমি জানি তোমার বাবার মনোভাবও এই।

ব্যথিত কণ্ঠে সুবর্ণ বল্লে, আমাকে আপনি ভুল বুঝলেন না সুধীনবাবু।

পারিবারিক কথা আমি জানি না, কিন্তু আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমা সমস্ত মনুষ্যত্বের বিনিময়ে আপনার মর্যাদা রক্ষিত হবে এ আশ্বাস দিতে পারি।

সুধীন ধীর স্বরে বল্ল, আমি তা জানি সুবর্ণ। জানি তুমি আমাে ভালোবাসো। কিন্তু প্রেম কি তোমার সান্ত্বনা পাবে? ঐশ্বর্যবান পিতামাতা সন্তান তোমরা। ঐশ্বর্যের কাহিনী তোমাদের রক্তস্রোতে শিরায় শিরায় স্নায়ুতন্ত্রে বিলাসের বীজাণু তোমাদের সর্বশরীর আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঐশ্বর্যের পরিচয় তুমি কখনো ভুলতে পারবে? আমি জানি পরীক্ষায় তুমি পাশ করবে, তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। কোনো ধনকুবেরের সন্তান বা কোনো আই-সি-এস হবে তোমার স্বামী। অস্থিতে মজ্জায় তোমাদের যে ঐতিহ্য চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান হবে তার। আমি কে? এক নগণ্য শিক্ষাব্রতীর দরিদ্র সন্তান, চল্লিশ কোটি জনসংখ্যার অবজ্ঞাত অখ্যাত এক ভগ্নাংশ। আমার কথা তখন তোমার মনেও পড়বে না।

টপ্ করে এক ফোঁটা জল হাতে পড়তেই সে চমকে উঠলো, তুমি কাঁদছো সুবর্ণ? কিন্তু তোমায় আমি অসম্মান করি নি। আঘাত হয়তো করলাম, কিন্তু প্রয়োজন ছিল এর। আমায় ক্ষমা করো তুমি।

সহসা সুবর্ণ বলে উঠলো তুমি নিষ্ঠুর সুধীন, তুমি নিষ্ঠুর। আঘাতের পর আঘাতই দিচ্ছ আমায়। তোমায় ভালোবেসে ভুল করেছি। বলে সুবর্ণ দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে লাগলো।

সুবর্ণর উচ্ছ্বসিত কান্না সুধীনকে বিমূঢ় করলো। কি করবে সে ভেবে পেলো না। সুবর্ণ কাঁদবে কল্পনাও করতে পারে নি। সুবর্ণর চুলের মধ্যে আঙুল রেখে সে বলতে লাগলো, কেঁদো না সুবর্ণ, তোমাকে আঘাত দিয়ে নিজেও যে আমি আঘাত পাই তা কি বোঝো না?

তড়িৎস্পৃষ্টের মত মাথা তুলে সুবর্ণ বল্লে, তবে? তবে তোমার কথা তুমি ফিরিয়ে নাও।

ফিরিয়ে নেবার কথায় সুধীনের মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে বল্লে, ফিরিয়ে নেবো, তার আগে আমায় প্রতিশ্রুতি দাও ঐশ্বর্যের সহজ অহমিকা তুমি ভুলে যাবে। আমার কথা সব আমি ফিরিয়ে নেবো, শুধু বলো নগ্ন পায়ে শীতের দিনে অনাহারে দুঃখবরণের আনন্দকে তুমি স্বীকার করবে, কোটি কোটি মানুষের দুঃসহ বুভুক্ষাকে সহজ সাধারণ দাবী বলে মানবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো সুবর্ণ। তার পর ধীরে ধীরে বল্ল, আপনি আমাকে যে ভাবে বলবেন, নিজেকে আমি সেই ভাবে প্রস্তুত করবো। আমাকে আপনি পন্থা দিন।

—পন্থা কিছু নয়, হয়তো আমি নিজেই জানি না তা। শুধু এইটুকু জানি বঞ্চনার দিন শেষ হতে চলেছে। আহ্বান যে দিন আসবে, সেদিন যেন তুমি নিজেকে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দিতে পারো। ওঠো, রাত হয়ে যাচ্ছে।

এ সময়টাতে প্রত্যেক বছরেই বাংলাদেশের এ অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জাপান যুদ্ধে নামায় খাদ্যাভাবের আশংকা আজ শুধু কাঁকনতলায় নয়, সারা বাংলায়। কিছু দূরে পলাশবনী। এরোড্রাম তৈরী হচ্ছে সেখানে। তৈরী হচ্ছে ফৌজের সেনাবারিক। এরি মধ্যে সৈন্যদল আসা শুরু হয়েছে। বাজারে মাঠে তাঁবু খাটিয়ে তারা আছে। পাৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিষ দিতে দিতে তারা হাঁটে, পথ-চলতি মেয়েদের দিকে মাংসলোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

নোতুন শহর গড়ে উঠছে পলাশবনীতে। পলাশ-শাল-মহুয়ার বিরাট অরণ্য

দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। মিলিটারি কণ্ট্রাক্টররা জংগল কেটে সাফ করছে। উড়োজাহাজ নামবার উঠান তৈরী হবে।

শীতের শেষে পলাশবনীর ঘন অরণ্যের শীর্ষ পলাশে পলাশে রাঙা হয়ে থাকে। কৃষ্ণচূড়ার ঘন পল্লবে লাগে সমারোহ। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন অরণ্যে আগুণ লেগেছে। সে আরণ্য শোভা অধিবাসীদের মনে ও আগুন ধরায়। দলে দলে সাঁওতাল আসে মাদল নিয়ে। পলাশবনীর সে সৌন্দর্য আজ শেষ হতে চলেছে।

কোলকাতা থেকে দলে দলে লোক আসছে—ভয়ার্ত মানুষগুলি। বিদেশীও আছে অনেক। বর্মী, মালয়ী, চীনা—এরাও অনেকে আসছে। সমস্ত বাংলায় এমনি করে ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা।

হরিহরের কুটিল মুখের বাঁকা হাসি আজ আর কারুর দুর্বোধ্য নয়। ধীরে ধীরে সবাই-ই বুঝছে ওই হাসির অন্তরালে আছে বৃশ্চিকের কুটিলতা। মানুষটা ভালো নয়, সবাই যেন আবার নোতুন করে সেটা উপলব্ধি করছে। ধানের দর চালের দাম ধীরে ধীরে উঠছে। স্থানীয় আড়তদাররা চাল আটকে রেখেছে। তাদের এজেন্ট ঘুরছে চতুর্দিকে। কার ঘরে বেশী ধান আছে—কে বেশী বিক্রি করতে চায়।

বর্ষা নামলো, প্রবল বর্ষা। আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের আক্রোশ। অবিশ্রান্ত জলধারায় ভেসে চল্ল কাঁকনতলা। দিনমজুররা আটকে রইলো ঘরে দশবারো দিন পর পর। ঘরের খোরাকী চাল সব খেয়ে ফেল্ল। ফুরিয়ে গেল তাদের পুঁজি-পাটা।

বিশু ঘরামী হরিহরের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘরে এক কণা চাল নেই। এক কড়ি পয়সাও নেই, দশবারো দিন দিন-মজুরী বন্ধ। কিন্তু হরিহর ধারে কারবার বন্ধ করে দিয়েছে। ফিরে গেল বিশু।

সারাদিন উনুন জ্বল্লো না। রাত্রে অন্ধকারে আত্মগোপন করে বিশুর বউ

এসে হরিহরের পা চেপে ধরলো। এদিক ওদিক চেয়ে নীচু গলায় হরিহর বল্লে, সের খানেক দিচ্ছি এখন। আসিস একটু রাত করে। বস্তা ভরে দেবো।

অন্ধকারে হরিহরের চোখ দুটো জ্বলে চক চক করে, বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাতে। শুকনো ঠোঁটটা সাপের মত পাতলা লিকলিকে জিভ দিয়ে একবার চেটে নেয়। তারপর হাসে আপন মনে হো হো করে। তিনকুলে পৃথিবীতে কেউ নেই হরিহরের, তবু তার আক্ষেপ নেই। ভাণ্ডার তার পূর্ণ আছে—সাত রাজার ধন তার ভাণ্ডারে। পৃথিবী জয় করবে হরিহর।

বেশ আছে সে।

চাল ক্রমশ অমিল হয়ে উঠছে। দাম বেশী কবুল করেও হরিহরের কাছ থেকে চাল পাওয়া যায় না। হরিহর প্রতিজ্ঞা করেছে অন্তত ত্রিশ টাকা না হওয়া পর্যন্ত চাল বার করবে না। ক্রুদ্ধ হয়ে নিধু কোবরেজ বলে, তুমি কি হে হরি? তোমার দেনা শোধ করতে গিয়ে বোয়ের চুড়ি বাঁধা দিয়েছি। আর তো কিছু পাও না আমার কাছে। [illegible] খানেক চাল দিলে তোমার কারবার ফেল হবে না। দামটা আজ না হয় কাল ঠিক তোমায় দিয়ে যাবো হে—

হরিহর গম্ভীর মুখে বল্লে, চাল কোথা? যা ছিল, সব ফুরিয়ে গেছে। বিকেলে আসার কথা আছে। বিকেলের দিকেই এসো খুড়ো।

—বিকেলে এলে পাওয়া যাবে কি না! হরিহরের ঔদাসিন্যে কোবরেজ মোটেই দমে না। ফতুয়ার পকেট থেকে ফস করে একটা সোনার চুড়ি বার করে হরিহরের হাতে দেয়।

—একেবারে খালি হাতে আসিনি হে আমি, হেসে ওঠে কোবরেজ, দে ভাই এবার। সেই চালটা মণ খানেক বার করে দে। ওটা থাক জমা। পরে বোঝাপড়া হবে'খন।

কিন্তু নিধুকে বিস্মিত করে হরিহর ওটা তাকে ফেরৎই দেয়। বলে, চাল

আমার ঘরে নেই, তোমায় মিছে বলছি না খুড়ো। বিকেলের দিকে বরঞ্চ এসো একবার।

কোবরেজ ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে থাকে হরিহরের মুখের দিকে। মূল্য সে তো দিতেই চেয়েছিল, শূন্য হাতে চাল নিতে আসে নি তো সে।

পলাশবনীর দিকে নাকি এ অঞ্চলের সমস্ত ধান-চাল যাচ্ছে। কোলকাতা থেকে নোতুন নোতুন আড়তদার এসে ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে। মোটা দর দিচ্ছে। মহাজনরা সবাই ছুটছে সেদিকে। ঘরের মাল সাফ করে তুলে দিচ্ছে পলাশবনীর আড়তদারদের কাছে।

কাঁকনতলা, সেনহাটি, চন্দ্রকোনা, পলাশবনী—অধিকাংশ লোকের ঘরেই আজ চালের অভাব। মূর্খের মত অর্থের লোভে দুর্ভিক্ষের দিনের মুখের গ্রাস ওরা নিঃশেষে তুলে দিয়েছে মজুতদারদের হাতে। জাপানীদের গল্প আর তেমন রোমাঞ্চকর লাগে না, সবাই ভাবছে নিজের বাঁচবার কথা।

চণ্ডীমণ্ডপে বিকেলে পঞ্চায়েৎ বসলো। বুড়ো কৃপাময় বিশ্বেস লাঠি ঠুকে বল্লে, আমার ঘরে বারো জন লোক—সকাল বিকেল পাত পড়ে চব্বিশটা। দুদিন হলো এক মুঠো চাল নেই। জোগাড় করতেও পারি নি!

অনেকেরই অবস্থা কৃপাময় বিশ্বাসের মত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এখনো কয়েকজন মহাজনের ঘরে কিছু ধান-চাল অবশিষ্ট আছে। বিক্রি বন্ধ করে কিছু কিছু প্রজাদের বণ্টন করলে এখনো দুর্ভিক্ষ রোখা যায়। রমেশ মুখুজ্যেকে কেন্দ্র করে পরামর্শ কমিটি তৈরী হলো। মহাজনরাও স্বীকৃত হলো আড়তদারদের কাছে চাল বিক্রি বন্ধ রাখতে।

এখানকার কংগ্রেস কর্মীদের নেতা রমেশ মুখুজ্যে। বয়স তাঁর বেশী নয় যদিও, পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। তবু সকলেই তাঁকে জানে, শ্রদ্ধা করে। দুর্ভিক্ষের আশংকার দিনে তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর অধিনায়কত্বে গড়ে উঠলো একটা কর্মীবাহিনী। তাদের কাজ হলো বাড়ী বাড়ী গিয়ে সবাইকে বোঝানো—ক্ষুদ-কুড়ো যার যা আছে, সবাই যেন তা রক্ষা করে। শুধু ধান-চাল নয়, নুন, চিনি, কেরোসিন এসবও। রেংগুনে জাপানীরা বোমা ফেলছে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজারেও বোমা পড়ছে, বংগোপসাগরে হয় তো এবার জাপানীদের জংগী-জাহাজ টহল দেবে, যে কোনো মুহূর্তে আমদানী রপ্তানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। ওদিকে আড়তদাররাও হাত গুটিয়ে বসে নেই—চোরাই কারবার চুপি চুপি চলে। গভীর রাত্রে, গ্রাম যখন একেবারে নিশুতি, সবাই যখন নিঃসাড়ে ঘুমায়, তখন বস্তা বস্তা ধান-চাল বহু জনের সতর্ক দৃষ্টির অগোচরে পাচার হতে থাকে গ্রাম থেকে। এই সময়ই হঠাৎ একদিন গুজব রটলো ঃ কাঁকনতলার জমিদার তাঁর সমস্ত ধান-চাল পলাশবনীর আড়তদারদের অত্যন্ত চড়া দামে বেচে দেবার সংকল্প করেছেন।

পরের দিন পড়াতে এসে সুধীন দেখলো সুবর্ণ পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মুখে যেন তার এক বিন্দু রক্ত নেই।

কাল রাত্রে তার ঘুম হয় নি। সুধীন ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করে। ঐশ্বর্য-পালিতা বলে তাকেও সে বিশ্বাস করে না, এই চিন্তাটাই সুবর্ণকে পীড়া দিয়েছিল। সমস্ত রাত্রি সে ছটফট করে কাটিয়েছিল। সারাটা দিন আজ ভারী ক্লান্তি বোধ করেছে।

শরীরকে আজ বড় দুর্বহ লেগেছে। মনে হয়েছে যেন আর সে নিজেকে বহন করতে পারবে না। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি। অবিন্যস্ত খোঁপা গ্রীবার উপর ভেঙে পড়েছে।

সুবর্ণকে দেখে সুধীন ব্যথিত হলো। বুঝতে পারলো আঘাতটা বড় মর্মান্তিক হয়ে লেগেছে সুবর্ণর। দুঃখ প্রকাশ করে সে বল্ল, তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে সুবর্ণ। কালকের জন্যে যদি তা হয়ে থাকে তবে মার্জনা চাইছি।

সুবর্ণ জবাব দিল না। সুধীন বল্ল, কেন যে কতকগুলো রূঢ় কথা বল্লাম। হয় তো উত্তেজনায় তোমার কথা না ভেবে আমি শুধু নিজের কথাই বলে গেছি। এর জন্যে কি বলে মাপ চাইবো জানি না।

সুধীনের কথা শুনে সুবর্ণর পাণ্ডুর মুখ মুহূর্তের জন্য আরক্ত হয়ে উঠলো। তবু সে কিছু না বলে বই টেনে নিল। সুধীন তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে শুধু বল্লে, আসুন, এবার আরম্ভ করা যাক।

সুধীন চেয়ার টেনে সুবর্ণের পাশে বসে পড়লো। আবার বল্লে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো সুবর্ণ, মিথ্যা আঘাত দিয়েছি তোমায়।

সুবর্ণ এবার মুখ তুল্ল। কঠিন স্বরে বল্ল, আঘাত যদি মিথ্যাই দিয়ে থাকেন, তবে ক্ষমা করার কথা আসে না। কালকের কথা আপনি ভুলে যান। আপনি আমার টিউটর, আমি আপনার ছাত্রী। আমাদের দুয়ের মাঝে আর কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না। বলে সে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়লো।

মার্জনার বদলে সুবর্ণর কাছ থেকে কঠিন জবাব পেয়ে সুধীন অবাক হয়ে গেল। সুবর্ণের উত্তর তার মর্যাদাকে আহত করলো। সে বল্ল, না, আজ থেকে আর আমি পড়াতে আসবো না তোমায়। আমারই ভুল হয়েছিল। প্রদীপকে যা বলবার আমি বলে দেবো।

বলেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। সুবর্ণর দিকে না চেয়েই বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে।

রাত তখন দশটা। সুবর্ণর মাথা ধরেছিল। তাই শুতে না গিয়ে লনের খোলা হাওয়ায় পায়চারি করছিল। পরাগ সে সময় সাইকেল নিয়ে হেঁটে ফিরছিল। গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণ। তাকে দেখে পরাগ জিজ্ঞাসা করলো, এখানে দাঁড়িয়ে যে সোনাদি ?

—দরকার আছে, সুবর্ণ বল্ল, তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে পরাগ ?

—অনুরোধটা আগে শোনা যায় না ?

সুবর্ণ বল্লে, তোমার সুধীদাকে একবার ডেকে দেবে এখুনি ? আসতে না চাইলে জোর করে একবার নিয়ে আসবে ? তুমি জানো না পরাগ ওর সংগে আমার এখনি দেখা করা দরকার। আমি এখানে আছি, তুমি ওকে পাঠিয়ে দাও।

শব্দহীন অন্ধকার রাত। মাথার উপরে কালপুরুষ জ্বলছে। উন্মুক্ত কৃপাণ নিয়ে আকাশে প্রহরা দিচ্ছে। ঝাউ-বীথির নরম অন্ধকারে একটা জোনাকি মিট মিট করে বেড়াচ্ছে, বোধ হয় সাথী খুঁজছে।

অন্ধকারে সুবর্ণকে ঠাহর করতে পারলো না সুধীন। ঘন ঝোপে নিবদ্ধ পাম আর ঝাউ। বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে অন্ধকার। হঠাৎ কাঁধে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে সুধীন চমকে উঠে ফিরে তাকালো। ঝাউ-বীথির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সুবর্ণ।

সুধীন জিজ্ঞাসা করলো, তুমি আমাকে ডেকেছ সুবর্ণ ? কিন্তু এই অন্ধকারে একা—তোমার সাহসও কম নয়।

—অন্ধকারে একা তোমারই জন্য অপেক্ষা করছি। শেষের কথাটা জানিয়ে গেলে, আমার কথাটাও জেনে নাও।

—কি বলো শুনি।

—সব তো আমি জানি। আমার মন দিয়েই আজ তোমাকে বুঝছি।

আমায় সংগে নাও তুমি। আজ আমাকেই তোমার প্রয়োজন। প্রয়োজনকে তুমি আজ অস্বীকার করতে পারো না।

সুধীন হাসলো। বল্লে, আমি নিষ্ঠুর স্বর্বণ। তাই যাবার সময় বলে যাই তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল। তোমার ওপর আমি অনেক আশা রাখি।

একটু থেমে বলতে লাগলো সুধীন, রাষ্ট্র বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। জাপানীরা এগিয়ে আসছে। আসাম-বাংলা বিপন্ন। দেশে দুর্ভিক্ষের আশংকা। হয় তো বেশ কিছুকালের জন্যই আমাকে কোলকাতা ছেড়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি আমার হৃদয় ভরে থাকবে স্বর্বণ। প্রয়োজন এখনো আসেনি, যেদিন আসবে, সেদিন আমি নিজেই আসবো তোমার কাছে।

স্বর্বণ বল্লে, তবে যাবার আগে কিছু দিয়ে যাও—

—দেবো। অকস্মাৎ সে স্বর্বণর হাতটা তুলে নিয়ে তার চাঁপার কলির মত আঙুলে ওষ্ঠের স্পর্শ দিল। গাঢ় অথচ ছোট্ট, গভীর অথচ তুচ্ছ একটা চাপ দিয়ে সুধীন স্বর্বণকে সেই অন্ধকারে একা রেখেই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলো।

—তিন—

আগষ্ট ১৯৪২।

সারা হিন্দুস্থান চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের নেতারা গ্রেফ্‌তার হয়েছেন। গান্ধীজী সমগ্র ভারতের সংহত শক্তিকে পুনরুদ্ধার করে কারাবরণ করেছেন। কারাগারে যাবার পূর্বে নির্দেশ দিয়ে গেছেন ঃ চল্লিশ কোটি নরনারীর ইপ্সিত লগ্ন এসেছে। স্বাধীন ভারতের নাগরিক্ হবার বিন্দুমাত্র কামনা যার আছে, সে যেন 'করে কিংবা মরে।'

করেংগে ইয়া মরেংগে। দেশকে স্বাধীন করবো নয় তো মরবো। এ প্রাণে পরাধীনতার শৃঙ্খল সয় না, আর সয় না।

সুধীন অস্থির চিত্তে পায়চারি করছিল। সুপ্রভা চুপ করে শুয়েছিলেন। কি বলবেন তিনি আজ? সুধীন তার শৃঙ্খলিত পিতার আত্মার সিংহনাদ শুনতে পেয়েছে। ওকে শান্ত করবার শক্তি নেই সুপ্রভার।

মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রমেশ মুখুজ্যে এলেন সুধীনের সংগে আলাপ করতে। আটুই আগষ্টের প্রস্তাব কার্যকরী করতে হবে।

রমেশবাবু বল্লেন, সুধীন, কংগ্রেসের মর্যাদা যে কোনো উপায়ে রক্ষা করতেই হবে। কাঁকনতলা, সেনহাটি, চন্দ্রকোনা, পলাশবনী—গ্রামে গ্রামে আন্দোলন গড়ে তুলে ইংরেজদের মুখের ওপর জবাব দিতে হবে। শুধু তাই নয় দুর্ভিক্ষ এগিয়ে এসেছে। ইংরেজ শাসনের বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সুনিপুণভাবে এই বিশৃঙ্খলাকে আমরা কাজে লাগাবো। এক হাতে দুর্ভিক্ষকে রুখবো, অন্য হাতে বিদেশী প্রভুত্বের অবসান ঘটাবো। এই হলো আমাদের কার্যক্রমের মূলনীতি। তুমি আমাদের সাহায্য করবে তো ?

সুপ্রভা স্তব্ধ হয়ে রমেশবাবুর কথা শুনছিলেন। রমেশবাবু তাঁর দিকে ফিরে বল্লেন, আজ জগদীশবাবু থাকলে এখানকার কংগ্রেস-আন্দোলন তিনিই পরিচালনা করতেন। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন আমরা যেন তাঁর যোগ্য শিষ্য বলে প্রমাণিত হই।

সুধীন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো মা-কে, তুমি অনুমতি দাও মা, দুশো বছরের জোর করে চাপানো অন্যায় অত্যাচারের প্রত্যুত্তর দিই।

ছেলের মুখের পানে তাকালেন সুপ্রভা। প্রতিশোধের সংকল্পে তার সুন্দর গৌর মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে। চোখে তার বহু দূরের দৃষ্টি। সুধীনের সে মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে তিনি ডাকলেন, সুধী, সুধী !

সুধীন সম্বিৎ ফিরে পেলো।—বলো মা, কি বলবে বলো। রমেশবাবু আজ আমাদের ঘরে এসেছেন। তুমি তাঁকে তোমার বক্তব্য বলো।

—আমি কি বলবো, আমি কত অসহায় তা তুই বুঝবিনে সুধী।

কিছুতেই তিনি দুর্বলতা গোপন করে রাখতে পারলেন না। সুধীন বল্লে, তোমার শেখানো বাবার সেই কথা আজ আমার কেবল মনে পড়ছে : পরাধীন দেশে সুখের চিন্তা পাপ। এ মন্ত্র তোমার কাছ থেকেই তো পেয়েছি আমি। মন্ত্রের সাধন আমায় করতে দাও।

পরাধীন দেশে সুখের চিন্তা পাপ। জগদীশবাবু কেবলি বলতেন এই কথা।

কথাটী ভুলন্তে বসেছিলেন সুপ্রভা। জগদীশবাবুর বংশধর আজ সেকথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল।

বিশীর্ণ ওষ্ঠাধরে তাঁর একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বল্লেন, তোদের সংগ্রামে যেন সাফল্য আসে, এই আমার একমাত্র কামনা।

ধীর কণ্ঠে বল্ল সুধীন, বিক্ষোভ হয়তো চরমে উঠবে। আন্দোলন বোধ হয় চূড়ান্তই হবে। ব্যর্থতা যদি আসে, তবে হয়তো জেল হবে। কিন্তু সে কথা ভাবলে চলবে না। পরাজয় মানলে চলবে না। এ সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রামে গড়ে তুলতে হবে। তুমি আশীর্বাদ করো। তোমার আশীষ আমার সকল বিপদের মাঝে রক্ষাকবচ হয়ে থাকবে।

সেই রাত্রেই কংগ্রেস কর্মীদের গোপন সভা বসলো। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সার্কুলারের বাংলা প্রতিলিপি পড়া হোলো: গান্ধীজীর শেষ আপোষ চেষ্টাকে কোনো সুযোগ না দিয়েই ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট নেতাদের গ্রেফ্‌তার করেছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে!

তিন নম্বর ইউনিয়নের এক গভীর বনের মধ্যে একটি পোড়ো বাড়ীতে সভা বসেছে। লোকে জানে সেটী ভূতের বাড়ী। জীর্ণ লুপ্তপ্রায় বাড়ী, ইটগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। নানারকম বন্যলতা গা বেয়ে উঠেছে। চামচিকে বাদুড়ের পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থলটা। মোমবাতির মিটমিটে আলোতে সভা বসেছে।

রমেশবাবুই প্রথম বল্লেন, গান্ধীজীর শেষ কথা আমাদের স্মরণ করতে হবে: ডু অর ডাই। উপযুক্ত মুহূর্ত আন্দোলনের। বহিঃশত্রুর আক্রমনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়ছে। এ সময় প্রবল আন্দোলন চালাতে পারলে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

আলোচনা আরম্ভ হলো। সুধীন বল্ল, বহিঃশত্রু আর অন্তর্বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদের শেষ সমাধি রচিত হবে। আন্দোলনে অংশ নিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু তার

আগে আমি প্রতিশ্রুতি চাই শোষিত সমাজ অর্থাৎ কিসানদের স্বার্থরক্ষা করে চলবে কংগ্রেস।

নিশ্চয়, রমেশবাবু বল্লেন, ওরাই তো আমাদের হাতিয়ার। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো সুধীন।

হাফ প্যাণ্ট হাফ সার্ট পরে বসেছিল অজয় সেন। শিক্ষিত পরিমার্জিত ভদ্র চেহারা। উত্তেজিত হয়ে সে বল্লে, এখন আন্দোলন ডাকার কোন অর্থ হয় না। ব্রিটিশ শাসনের অবসান নিশ্চয়ই চাই, তাই বলে নোতুন শোষণ চাইবো না। নোতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এগিয়ে আসছে। ব্রিটিশ গেলে সে এসে বসবে। তার অর্থ খাল কেটে কুমীর আনা!

অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। সুধীন তা লক্ষ্য করে বল্ল, নেতারা কারারুদ্ধ। সমস্ত দেশে আজ গণ-বিক্ষোভ রূপ নিচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘায়েল করার এই তো সুযোগ। জাপান আসবে না—সে চায় প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ইংরেজ তাড়াতে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সে সম্মান জানিয়েছে। এ সুযোগ নষ্ট হলে আর আসবে না। এখনি আন্দোলন শুরু করা হোক। দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দেখা দিয়েছে। এনার্কি ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। এই তো সুযোগ!

অন্যান্য ইউনিয়ন থেকে গ্রাম থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই-ই আন্দোলনের স্বপক্ষে মত দিলেন। শুধু এক কোণে বসে অজয় সেন ব্যংগ ও অবিশ্বাসের হাসি হাসলো।

আন্দোলন গড়ে উঠছে। স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের গোপনে তালিম দেওয়া

হচ্ছে। পরামর্শ কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী নির্দেশ পাঠাচ্ছেন রমেশবাবু।

জমিদার ব্রজেনবাবু গোলার সমস্ত ধানচাল পলাশবনীর আড়তদারদের ছেড়ে দিতে চান। কথাটা আর গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে চড়া দর হাঁকছে আড়তদাররা। লোভ সামলাতে পারছেন না ব্রজেনবাবু। আড়তদারদের সম্বন্ধে নানা আজগুবি গল্প লোকের মুখে। ওরা নাকি জামাকাপড় পরে না, আপাদমস্তক সোনায় মুড়ে বসে থাকে।

হরিহরের দোকানে চাল পাওয়া যায় না। ষ্টকের দেড়শো মণ চাল বেড়ে বেড়ে পাঁচশো মণে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তবু হরিহর মনে মনে বলে, কি আর হয়েছে এখন! শুধুই কি আর মহাজনরা মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে ধান চাল সংগ্রহ করছে। ওতে আর হাত দিচ্ছি না এখন!

কাঁকনতলার ঘরে ঘরে চালের অভাব শোচনীয় হয়ে উঠছে। দুশো ক্ষুধার্ত পরিবারের মুখের গ্রাস বঞ্চিত করে জমিদার আড়তদারদের ঘরে সমস্ত চাল তুলে দেবার মনস্থ করছেন শুনে প্রজারা সবাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেনহাটিতে জমিদারবাড়ী গিয়ে সুধীন ব্রজেনবাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থী হলো, কিন্তু দেখা পেলো না তাঁর। তিনি কোথায় গেছেন। বেরিয়ে এলো তাঁর ম্যানেজার।

সুধীন সোজাসুজি বল্ল, কাঁকনতলার দুশো পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে আমি তাদের বক্তব্য জানাতে এসেছি। এই দুর্দিনে তারা আপনাদের প্রত্যাশায় বসে আছে।

ম্যানেজার জবাব দিল না। সুধীন বল্লে, কি অন্যায় কথা শুনছি দেখুন তো! দুশো ঘর প্রজা এক মুঠো চালের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, অথচ শুনছি আপনারা নাকি গোলার সমস্ত ধানচাল ব্যাপারীদের আড়তে তুলে দেবেন। এত বড় অন্যায় নিশ্চয়ই আপনাদের দ্বারা হবে না।

বলি না ওকে। ভালো লাগে না। সুমিত্রাটাও তবু ছিল এখানে। সেও চলে গেল কোলকাতায়। আমিই পাঠালাম। তবু সেখানে কিছু মিল্‌ছে।

ভিতরে গিয়ে ইন্দুমতী কাপড় ছেড়ে এলো। বল্লে, পান খাবেন? ভারী মিঠে সুগন্ধী পান। খেলে মুখ জুড়িয়ে যায়।

সুধীন বল্ল, পান আমি খাই না, তবে আপনি দিচ্ছেন, নিশ্চয় খাবো।

পান সেজে নিয়ে এলো ইন্দুমতী। সুধীনকে দিয়ে বল্ল, একটা কথা বলবো ভাবছি। আদব-কায়দা আমি বুঝি না। বয়সে আমরা দুজনেই সমান সমান। সম্বোধনের পর্যায়টা আমাদের আপনি ছেড়ে তুমিতে আসুক না। আপনার আপত্তি না থাকলে আলাপকে সহজ করে নিতে চাই।

—যথা অভিরুচি ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী বল্লে, পরাজয়-ব্যর্থতার কথা কি বলছিলে যে! পরাজয় কোথায়? সংসারে সব পাওয়াটাই কি বৃহৎ জয়ের প্রকাশ? না-পাওয়ার দাম কি কিছুই নয়? তাছাড়া, আমার বেলায় পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সোজা যা বুঝি তাই বলছি। গরীবের ঘরের মেয়ে আমি, গরীবের সংসারে এসেছি। ক্ষতিটা আমার কই? কিছু শিক্ষালাভ করেছিলুম শহরে, ভারসাম্যটা সেজন্য—

বাধা দিয়ে সুধীন বল্ল, মেয়েদের মনের কথা আমি জানি না। তবু তো মনে হয় তারা কামনা করে সুন্দর স্বাস্থ্যময় পুরুষ, প্রচুর আভরণ, সম্মানিত সংসার—

হেসে বল্ল ইন্দুমতী, সে কামনার দাম কতটুকু, যে কামনার মধ্যে বাস্তববোধ নেই? আমি স্বীকার করি আমার অভাব আছে, কিন্তু সেটা তো জীবনের পরাজয় নয়, তাকে বিপর্যয় বলো সুধীন। এই তো হেসে খেলে কাটাচ্ছি। দুর্ভিক্ষে যদি মরণ হয় তো সবার সাথে মরবো। একা মরবো না। বাধা

দেবার প্রশ্ন তুলবে জানি। কিন্তু সে কাজ আমাদের নয়, তোমাদের। দুঃখ তো বন্ধু হয়ে এসেছে। তাই হাসিও আজ স্বাভাবিক।

বলে ইন্দুমতী মধুর হাসলো। মুগ্ধ করলো সুধীনকে। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বল্ল, তোমার কাছে এইটাই আমি প্রত্যাশা করছিলাম ইন্দুমতী। এখন উঠি কমরেড।

সেইদিনই এক ক্রোশ পথ হেঁটে ইন্দুমতী একা চলে এলো সেনহাটিতে—কাঁকনতলার জমিদার বাড়ীতে। ইন্দুমতী একেবারে সোজাসুজি মেজবাবুকে খবর দিতে বল্ল।

কর্তার মেজ ছেলে অর্থাৎ প্রশান্ত। ছেলেরাই জমিদারী দেখছে এখন। একটী মেয়ে দেখা করতে এসেছে শুনে সে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলো। ইন্দুমতীকে দেখে সে বল্ল, তুমি এসেছো! আমি ভাবলাম—

—কি ভাবলে শুনে আমার পেট ভরবে না। ক্ষিদে মেটাবার মত খাদ্য দাও, নিয়ে যাই, অপরূপ ভংগী করে বল্ল ইন্দুমতী।

সে ভংগী নিরীক্ষণ করে প্রশান্ত বল্ল, এখানে নয়, ওপরে চলো, আমার ঘরে। ইন্দুমতীকে সংগে করে নিয়ে এলো উপরে। একটী নরম সোফায় বসিয়ে দিলো তাকে। তারপর সযত্নে একটী মূল্যবান সিগারেট ধরিয়ে ইন্দুমতীর সম্মুখের একটী সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলো, অসময়ে মনে পড়লো যে—

অসময় নয়। অভিসারে এসেছে ইন্দুমতী। আজ তাকে বিজয়িনী হতে হবে। অংগে তার মোহনীয়া সজ্জা। রক্তরঙা আংরাখা তার গায়ে। তার ওপর চড়িয়েছে নীলাম্বরী ঢাকাই। সযত্ন পরিচর্যিত কেশ, কবরী রচনা সার্থক হয়েছে মালতী-চম্পকে। চোখের কোণে আঁকা ভীরু কাজলরেখা বর্ষামেদুর আকাশের শ্যামশ্রীকে মনে পড়িয়ে দেয়। বকুলের মাল্য বুকের মাঝখানটীতে এসে থেমে রয়েছে—যেন প্রিয়-কণ্ঠের স্পর্শলাভে উৎসুক। অভিসারিণী ইন্দুমতী—বাসকসজ্জা তার সফল হোক।

প্রশান্ত সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে, তুমি আমার বুকে শুধু আগুনই জ্বালিয়ে তুলছো। কি মতলবে এসেছ শুনি!

—সেনদীঘি থেকে একদিন ফেরার পথে তুমি আমায় বলেছিলে প্রয়োজনের ক্ষণে তোমায় যেন না ভুলি। তোমায় আমি ভুলিনি প্রশান্তদা। ঘরে এক মুঠো চালও নেই।

কথায় যেন ইন্দুমতীর মদ আছে। শুনলে মাদকতা আসে। তবু প্রশান্ত কৌতুক বোধ করে বল্ল, তাই বুঝি আমায় ভোলাতে এসেছ। কিন্তু ছলনাময়ী, বাসরের স্বপ্ন কেন আর, নববধূর বেশই বা কেন? অতিক্রান্ত-স্বয়ংবরাকে তো মানায় না মোটে।

মুহূর্তে ইন্দুমতী ম্লান হয়ে এলো। প্রশান্তর দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতেও পারলো না। প্রশান্ত বল্ল, কি করতে পারি ইন্দু! এ বাড়ীর সম্পদ একদিন তোমার দাবী হতে পারতো।

অপমানিত হতে চাইলো না ইন্দুমতী। দৃঢ়কণ্ঠে বল্ল, দাবী জানাতেই এসেছি আজ—প্রজার দাবী নিয়ে। তোমাদের নিশ্চিন্ত আলস্যের একটু ব্যাঘাত হয় তো হলো—

—কি চাও বলো।

—চাই খাদ্য। এ দুর্ভিক্ষে চাই বাঁচতে—

—খুব কষ্ট তোমাদের, না? প্রশান্ত একটু ভাবলে, তারপর বল্লে, বেশ আমি লিখে দিচ্ছি, আচ্ছা থাক, আমি নিজে গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে বলে দিচ্ছি—দু বস্তা চাল তোমায় দিক।

ইন্দুমতী অবাক হয়ে বল্ল, দু বস্তা চালে গোটা কাঁকনতলার পেট ভরবে না। তুমি পরিহাস করছো নাকি?

প্রশান্তও অবাক হয়ে বল্ল, আমিও ওই কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী বল্লে, প্রশান্তদা, তুমি কি ভাবো ইন্দুমতী তার উপবাসী প্রতিবেশীদের বাদ দিয়ে নিজের পেটের কথা ভাবছে ? তুমি হয়তো জানো না—

কথার মাঝখানেই প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো ইন্দুমতী। গোটা গাঁকে আমরা নিশ্চয়ই খাওয়াতে পারি না।

—কেন পারো না ? প্রজাদের অভিভাবক কি নও তোমরা ? দুঃখের দিনে তোমাদের সাহায্য না পেলে ওরা বাঁচবে কেমন করে শুনি ?

—তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি ইন্দুমতী, সুসময় না আসা পর্যন্ত প্রতিমাসে এখান থেকে চাল নিয়ে যাবে এমন ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। কিন্তু সমস্ত গ্রামকে—যাক সে কথা। নিজেদের খাদ্য বাদে আমাদের গোলার সমস্ত ধানচাল বেচে দেওয়া হয়েছে।

—বেচে দেওয়া হয়েছে ! ইন্দুমতী স্তম্ভিত হয়ে গেল।

প্রশান্ত সিগারেটে জোর টান দিয়ে একটা দীর্ঘ ধোঁয়া বার করে নিশ্চিন্ত আলস্যসুখ বোধ করে বল্ল, হ্যাঁ, অবাক হবার কি আছে ? বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বোধ করলো না সে, পলাশবনীর মহাজনদের এগ্রিমেণ্ট করে দেওয়া হয়েছে। টাকা ওরা আগাম দিয়েছে। টাকাটা খুবই প্রয়োজন ছিল এসময়। ইন্দুমতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে আড়ম্বর করে প্রশান্ত বলতে লাগলো, কাল সকালে একশো গোরুর গাড়ী আমাদের ধানচাল নিয়ে পলাশবনীর আড়তে রওনা হবে। সুতরাং এখন গ্রামের সমস্ত লোকদের খাওয়া পরার কথা বলা অবান্তর !

—সুন্দর ! ধন্যবাদ দিয়ে যাই যাবার সময়। উঠে পড়লো ইন্দুমতী। আর থাকার প্রয়োজন নেই। ঘৃণায় ক্রোধে সর্বাংগ তার কণ্টকিত হয়ে উঠেছে দম্ভ লোভ আর স্বার্থ এদের পিশাচ করে তুলেছে। আর একটুও থাকার প্রয়োজন নেই এখানে।

তাকে উঠতে দেখে পথরোধ করে প্রশান্ত বল্ল, এখনি যাবে ? আরেকটু বোসো। আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে তো আমি—

প্রয়োজন নেই জবাব দেবার। প্রয়োজন মিটে গেছে ইন্দুমতীর। প্রশান্তকে স্তব্ধ বিহ্বল হতবাক করে দৃপ্ত ভংগীতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে।

গভীর রাত্রে লোকাল বোর্ডের সদর রাস্তায় চারখানা গ্রামের সমস্ত কৃষক জড় হয়ে মশালের আলোয় মাইল দুয়েক রাস্তা খুঁড়ে ফেল্ল। সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল সক্রিয়ভাবে।

সকালে একশো গোরুর গাড়ী যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই ফিরে গেল। ভিন্‌গাঁয়ের গরীব মুসলমান গাড়োয়ানরা বেশী টাকার লোভে ধান চালান দেবার দুঃসাহস নিয়ে এসেছিল। তাঁরা ফিরে গেল অবাক হয়ে, ফিরে গেল বেকুফ হয়ে। ফিরে গেল চারখানা গ্রামের সম্মিলিত শক্তিকে বাহবা দিয়ে। যাবার সময় সুধীনের কাছ থেকে নিয়ে গেল জমিদারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পরামর্শ।

কোলকাতা থেকে সুধীনের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন মিষ্টার মজুমদার। সুধীন লেখাপড়া ছেড়ে গ্রামে এসে স্বদেশী করছে, তাকে প্রতিনিবৃত্ত করা তাঁর কর্তব্য। সরকারের নিমক খান তিনি।

স্যুট পরে এসেছেন মিষ্টার মজুমদার। সুপ্রভা কাজলীকে নিয়ে বসেছিলেন। মজুমদারকে তিনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন।

মাদুর পাতা ছিল ঘরে। তা সত্ত্বেও ভগিনীপতিকে বসতে দেবার জন্যে টুল এনে দিলেন। ঘরে একটীমাত্র টেবিল আছে, তার ওপর রাজ্যের বইপত্র এনে জড় করে রেখেছে সুধীন। কিন্তু চেয়ার নেই। সায়েবী পোষাক পরা মানুষকে মাদুরে বসতে দেওয়া যায় কি করে?

ঘরে কিছুদিন আগের আনা একটী চায়ের প্যাকেট রয়েছে। এখনো

সেটা খোলাও হয় নি। সুপ্রভা কাজলীকে বল্লেন, এক কাজ কর দিকি মা, সেই চায়ের প্যাকেটটা খুলে তোর মেসোমশাইয়ের জন্যে একটু চা তৈরী করে দে।

বাধা দিয়ে মিষ্টার মজুমদার বল্লেন, চা থাক দিদি। সুধীন কি করে বেড়াচ্ছে বলুন তো? লেখাপড়া ছেড়ে চলে এলো কেন হঠাৎ?

কথাটা সুপ্রভার কানে জেরার মত শোনালো।

সুপ্রভা সত্য কথাই বল্লেন, আন্দোলনে যোগদান করেছে সে।

—খুব ভালো কাজ করেনি, গম্ভীর হয়ে মিষ্টার মজুমদার বল্লেন, লেখাপড়া করলে জীবনে ঢের উন্নতি করতে পারতো। আমিই ওকে ভালো কাজ জুটিয়ে দিতে পারতুম। এখন কিছু একটা হলে আপনারও বিপদ, আমারও কম হাংগামা নয়।

অর্থাৎ সুধীন তাঁর আশ্রয়ে থেকে মানুষ হয়েছে, আশ্রয়দাতা হিসাবে সেজন্য তাঁর সুনামের হানি হতে পারে।

ভগিনীপতির কথার ধরণে সুপ্রভা বিরক্ত হলেন। বল্লেন, সুধীন বড় হয়েছে, শিক্ষাও পেয়েছে। সে যার ছেলে, তাঁকে আজও চারখানা গাঁয়ের মানুষ শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করে। বাপের আদর্শ তার সম্মুখে। জীবনে যা সে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তা তাকে অস্বীকার করতে বলি কেমন করে?

—জীবনে সত্যটাই কি খুব বড়? দুঃখের পৃথিবীতে সত্যের আসল দামই বা কে দেয় শুনি? মিষ্টার মজুমদার পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

আভিজাত্যের অহমিকায় অন্ধ মজুমদারের মুখে সত্য আর দুঃখের কথা শুনে সুপ্রভার হাসি পেলো। তিনি বল্লেন, সত্য কেনা-বেচার জিনিষ নয় ভাই। দামের কথা আসে না।

মিষ্টার মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু দিদি, ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেছেন? জেল হতে পারে ওর। কত বছর তা কে জানে? যুদ্ধ চলছে,

গভর্ণমেণ্ট এখন স্বদেশীদের ওপর খাপ্পা হয়ে আছে। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এসেও ও যে সব রকম সুখ-সুবিধা পাবে, এমন তো না হতেও পারে।

—তা যদি হয়, তবে দুঃখ সহ্য করতেই হবে ওকে, সুপ্রভা ধীরস্বরে বল্লেন।

সুপ্রভার কথার সুর লক্ষ্য করে লজ্জিত হয়ে উঠলেন মজুমদার। তাড়াতাড়ি বল্লেন, না-না, তা যেন না হয়, তা যেন না হয়। তবে দুঃখের পথ এড়িয়ে চলাই উচিত। আমি ওর ভবিষ্যতের কথা বলছিলাম

সুধীনের মা চুপ করে রইলেন। সুধীনের বাবার কথা তাঁর মনে পড়লো, পরাধীন দেশে সুখের চিন্তা পাপ।

মুখ গোমড়া করে উঠে গেলেন মিষ্টার মজুমদার। সুপ্রভাকে তিনি বোঝাতে পারেন নি, পারবেনও না। অভিশাপের বংশ এদের। এরা জীবনের সহজ পথটা এড়িয়ে চলে, ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করে বুদ্ধিহীনের মত। এরা চায় না বনস্পতির ছায়াতলে জীবনের বাড়-বৃদ্ধি। সাহারার উত্তপ্ত বুকে তৃণের যে মৃত্যু, তা-ই যেন এদের প্রিয়।

আকাশ অন্ধকার করে আসছে। পুঞ্জীভূত মেঘের ভার। জমুক মেঘ আকাশে, হয়তো বা এই শেষবারের জন্যেই সেখানে মেঘের জটিলতা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ও-ই তো স্ফুলিংগ!

বাহিরের পানে চেয়েছিলেন সুপ্রভা। গ্রামের পথে জনতার মিছিল জমছে। তাঁর সুধীনকে সে মিছিল যেন কোথায় গ্রাস করে নিয়েছে।

কর্মীদের গোপন সভায় ডাক পড়লো বিশু ঘরামীর। সে আসতেই জিজ্ঞাসা করা হলো, চাল পাচ্ছো কোত্থেকে ?

—কোত্থেকে পাবো বাবু, সবাই না খেয়ে কাটাচ্ছে, আমার দশাও সকলের মত।

—চুপ করো, মিথ্যা বলো না, সুধীন ধমক দিয়ে বল্ল, আমরা খবর পেয়েছি হরি মুদির কাছ থেকে তোমরা চাল পাও।

বিশু হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠলো, হেঁই বাবু, দ্যাখেন তো, কে খবর দিল এসব—

সুধীনের কড়া ধমকে তার কান্না থেমে গেল। সুধীন বল্ল, কোনো ভয় নেই তোমার, আমি অভয় দিচ্ছি। হরি মুদি তোমাদের চাল দেয়, একথা সত্যি কিনা বলো।

বিশু সহসা সুধীনের পা জড়িয়ে ধরলো, দোহাই বাবু, গরীব মানুষ—বাদলায় কাজ ছিল না, সেই তখন খোরাকীর চাল সব খেয়ে বসে আছি।

হুঁম্, সুধীন গম্ভীর হয়ে বল্ল, তুমি যাও বিশু।

পাঁচশো লোক এলো সুধীনের পিছু পিছু। হরিহর তামাক খাচ্ছিল একা। সুধীন বল্ল, হরি কাকা, লোকে এবার দুটো চালের অভাবে না খেয়ে মরবে আর তুমি বসে বসে তাই দেখবে। তবু মজুত চাল ছাড়বে না?

হরিহর ভয়ানক অবাক হয়ে যায়। হুঁকো নামিয়ে রেখে বলে, আমার ঘরে চাল মজুত আছে, এ মিথ্যে খবর কে দিলে তোমায় সুধীনবাবু?

—এ কথা মিথ্যে নয় হরি কাকা, রুপোর লোভ তোমাকে কোথায় নামিয়েছে তা বোঝবার বুদ্ধি আজ তোমার নেই। ভেবেছো মণ মণ চাল ষ্টক করে নিশ্চিন্ত আরামে বসে তামাক খাবে, তারপর যখন লোকে না খেয়ে মরতে শুরু করবে, তখন ধূর্তের মত সেই চাল হাটে বার করবে। তোমাকে এর জন্যে শাস্তি পেতে হবে।

হরিহরের মুখটা ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে যায়। বিশাল জনতার দিকে চেয়ে সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। মুহূর্তে কি যেন হয়ে যায়, কে যেন হরিহরকে সহসা ধাক্কা দিয়ে পাঁজাকোলা করে বাহিরের মাঠে ছুঁড়ে দেয়। তারপরই শুরু হয় লুঠ। দেখতে দেখতে হরিহরের অনেক দিনের জমানো অঁত সাধের পাঁচশো

মর্ণ চাল বুভুক্ষু গ্রামবাসীদের ঘরে গিয়ে ওঠে। আন্দোলনের সাফল্যে সবার মুখে ফুটে ওঠে হাসি।

এইবার প্রস্তুত হতে হবে। চাল লুঠের খবরটা যথাসময়েই পৌছে যাবে থানায়। এবং যথাসময়ে পুলিশ আসবে অপরাধীদের শাস্তি দিতে। কাঁকনতলার গ্রামের বাইরে সাঁওতালদের বাস। জন্মগত বিদ্বেষ তাদের পুলিশের উপর। কবে কোনকালে সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়েছিল, সেই থেকে পুলিশ আর শ্বেতচর্মকে তারা ঘৃণা করে আসছে। প্রচারকার্য চলছিল তাদের মধ্যে। কর্মীরা ছুটলো তাদের কাছে। সময় নেই বেশী, হয় তো ঘণ্টা তুয়েকের মধ্যেই খবর পেয়ে পুলিশ আসবে। জড় হলো হাজার সাঁওতাল তীর-ধনুক নিয়ে। বিষ মাখানো তীরের ফলা। কাঁকনতলার জংগলে লুকিয়ে রইলো তারা।

কয়েক ঘণ্টা পরেই খবর এলো পুলিশ আসছে। এইবার শত্রুর সংগে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাধবে। কাঁকনতলার প্রতিটী প্রাণী হাতের কাছে যা পেলো, তাই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো। যুদ্ধের মুহূর্ত আগত। এ মুহূর্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন—ডু অর ডাই।

স্তব্ধতা বিরাজ করছে গ্রামে। অস্বাভাবিক নিঃশব্দতা। তৃণপল্লব পর্যন্ত নড়ছে না। নিঃশ্বাস রোধ করে মানুষ প্রতীক্ষা করছে। বাকশক্তিবিহীন্। ভাষা যেন হারিয়ে গেছে, গতি যেন লোপ পেয়েছে। যেন কারখানার আবর্তনশীল যন্ত্রদানব বিকল হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা নয়, যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে গোপনে।

তু একজনকে গ্রেফ্‌তার করলে পুলিশ, কেউ বাধা দিল না। পরমুহূর্তে শোনা গেল এক বিরাট কল্লোল—লক্ষ কণ্ঠের সম্মিলিত রণহুংকার। সাঁওতাল বাহিনী

আসছে উদ্যত তীরের ফলা বাগিয়ে। চতুষ্পার্শ্বের অরণ্য-আশ্রয় থেকে বৃত্তাকারে আসছে উন্মাদ আরণ্য মানুষ। আতংকিত স্তব্ধবাক সাম্রাজ্যরক্ষীদলকে তারা বেষ্টন করে ফেল্ল।

দারোগা লোকটী ভদ্র। এ দুঃসময়ে ভদ্র না হয়ে উপায়ই বা কি! বন্দী হয়ে বল্ল, পেটের দায়ে মনুষ্যত্ব বিক্রি করছিলাম এদ্দিন। যা শাস্তি দিতে হয় দেবেন পরে। উপস্থিত উর্দি ছাড়িয়ে খদ্দর পরিয়ে দিন।

ঠিক কথা। পুলিশের ইউনিফর্ম পুড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রস্তাব হলো পলাশবনী থেকে নোতুন কাপড় এনে দেওয়া হবে ওদের।

অন্ধকার পথে টর্চের আলো ফেলে দুঃসাহসী কয়েকটী ছেলে এগিয়ে চলেছে রেল-লাইনের দিকে। বুকে দুর্জয় সাহস আর স্থির লক্ষ্য নিয়ে ওরা চলেছে। হাতুড়ি ছেনি ফিশপ্লেট সরাবার যন্ত্র রয়েছে কাছে। নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করে কুড়ি হাত অন্তর অন্তর রেল-লাইনের উপর লাল আলো বসিয়ে চলে এলো তারা।

টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হলো। বাহিরের পৃথিবী থেকে কাঁকনতলা সেনহাটি চন্দ্রকোণা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এবার সব-রেজিস্ট্রেশন অফিস পোড়াবার পালা।

সারাদিন সুধীন আসে নি। সুপ্রভা বারে বারে দুয়ারের দিকে তাকাচ্ছেন, ওই বুঝি সুধী এলো। কোথায় সে খাওয়া দাওয়া করেছে কে জানে, হয়তো

খাওয়াই হয়নি তার। সুপ্রভার বুকটা খালি হয়ে যায়। বুকে যেন একটা বিরাট শূন্যতা, এ শূন্যতার গহ্বর যেন আর জীবনেও পূর্ণ হবে না। সুধীন কতদূরে চলে গেছে, সুপ্রভার নাগালের বাইরে, কোথায় কোন এক বৃহৎ আবেষ্টনীর মাঝে।

অনেক রাত্রে সে এলো। সুপ্রভার বুকের মধ্যখানে বহু বহু দিন আগেকার মত ছোট্ট শিশুটী হয়ে ঘুমিয়ে রইলো সে। তৃপ্তিতে শান্তিতে সুপ্রভার গণ্ড বেয়ে অশ্রু নামতে থাকলো।

অলস মন্থর চোখের পাতা জড়িয়ে এলো গভীর ঘুমে। স্বপ্নের ঘোরে সুপ্রভা দেখেন, জগদীশবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সম্মুখে। শুভ্রবাস পরিহিত জ্যোতির্ময় দেহ। সুপ্রভার দিকে চেয়ে হাসলেন। সূর্যকরের মত সে হাসির আলো সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়লো।

সুপ্রভা তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। আনন্দে সর্বাংগ তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বল্লেন, এত দিন পরে তুমি এলে ?

—হ্যাঁ এলাম। সময় হলে তবে তো আসবো।

—হ্যাঁগো, রমার বর আজ যে কথা বলে গেলো, সব সত্যি ? সুধীর কি খুব বিপদ ?

—দুঃখজয়ের পথে চলেছে সুধী। আজ কত অন্ধকার জমেছে চারিদিকে জানো সুপ্রভা ? এ অন্ধকারের আবর্ত মানুষের দৃষ্টিকে বন্ধ করে দেয়। সুধী আমাদের সুধী এই অন্ধকারের রাজ্যে আলো আনতে চলেছে। সেই কথাই তো বলতে এলাম।

—সুধীর কোনো বিপদ হবে না তো ?

—দুর্গম যাত্রা ওদের, কঠিন শিলাতল পায়ে পায়ে রক্ত ঝরায়, কালবোশেখি উন্মত্ত হাহারবে আর্তনাদ করে, ঝঞ্ঝাময় রাত্রে পৃথিবী দুর্যোগের গান গায়। ওরা নোতুন যুগের ভগীরথ। মিথ্যা ভয় পাচ্ছো সু, সুধীর কিছু হবে না।

জগদীশবাবুর জ্যোতিষ্মান দেহ মিলিয়ে গেল। সুপ্রভা আকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

সুধীন বলছিল, হয়তো কিছুদিনের জন্যে আসতে পারবো না মা, এবার ব্যাপক কাজ শুরু হবে। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের শেষ শিকড়টা পর্যন্ত তুলে ফেলা হবে। তুমি ভয় পেও না মা।

জগদীশবাবুর কথা মনে হলো তাঁর ঃ দুর্গম যাত্রা, রক্তক্ষরা কঠিন শিলাতল, ঝঞ্ঝাময় রাত্রি। নোতুন যুগের ভগীরথরা স্বর্গজয় করতে চলেছে। চোখে তাদের স্বাধীনতার তৃষ্ণা, মুখে মুক্তির আনন্দ, হাসিতে রামধনুর আলো।

মার বুকে মুখ রেখে সুধীন বল্লে. তোমার চোখে জল কেন মা? তোমার চোখের জল দেখে কি করে বাইরে যাবো বলো।

সুপ্রভা জবাব দিলেন, কই আমি কাঁদচি না। তোকে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে।

—এই তো চাই মা, তোমায় আমি সেই যে গল্প বলেছিলাম পাভেলের গল্প, তুমি আমার সেই পাভেলের মা। তুমি আমার উৎসাহ দিচ্ছ আমার সমস্ত কাজে, আমার সকল প্রেরণায়। দুঃখ হয়তো আসবে আরো, বিপদ হয়তো ভয় দেখাবে, তবু তুমি মনে করো তোমার একটী ছেলে নয়, লক্ষ ছেলে ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে দুঃখজয়ের দুর্গমপথে যাত্রা করেছে!

সেই জগদীশবাবুর কণ্ঠস্বর। সুধীনের মধ্যে তিনি জগদীশবাবুকে দেখছেন। সেই মুখ, সেই স্বর, সেই আশার আবেগ, স্বপ্নের দুরাশা, আদর্শের সজ্ঘাত, অজেয় মানবাত্মার অনির্বান শিখা!

স্বাধীনতার কামনাটা কি অত্যুগ্র! এর দীপ কখনো নিভবে না। অতীত নয় আজ নয় আগামী কালও নয়, এ অনন্তকালের আলোকবাহী মশাল, এর ক্ষয় কখনো হবে না বুঝি। কি তীব্র এর নেশা, মানুষকে পাগল করে দেয়।

তবু তিনি কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। একমাত্র পুত্র তাঁর বিদায় চাইছে, এ তিনি কোনোদিনই কল্পনা করতে পারেন নি। জগদীশবাবু যেদিন চলে যান, সেদিনও তিনি এত বিচলিত হন নি। চোখের জল আজ আর বাধা মানতে চাইছে না।

তবু প্রাণপণে কয়েক মুহূর্তের অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস দমন করে করে অত্যন্ত সহজ স্বরে বল্লেন, তোর সাধনা জয়যুক্ত হোক। সত্যাশ্রয়ীর পথ থেকে কখনো যেন বিচ্যুত হোস না।

মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে ছোট্ট একটী স্যুটকেশ সংগে নিয়ে সুধীন বেরিয়ে এলো। প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন সুপ্রভা।

সব-রেজিষ্ট্রেশন অফিস পোড়াবার কয়েক দিন পরেই শোনা গেল নোতুন সশস্ত্র পুলিশ আসছে। আর ইতিমধ্যেই নাকি গোয়েন্দা এনে গ্রামে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা খোঁজ করে বেড়াচ্ছে আন্দোলনের নেতাদের। এর পরে রমেশ মুখুজ্যে, সুধীন ও অন্যান্য কর্মী নেতাদের প্রকাশ্য চলা-ফেরা করবার উপায় রইলো না। আত্মগোপন করতে বাধ্য হলো তারা।

একদিন হঠাৎ কাঁকনতলায় এসে হাজির হলো সশস্ত্র পুলিশ। সেইদিনই তারা বিপ্লবীদের সমস্ত সংগঠন সমস্ত আন্দোলন সকল আশাদৃঢ়তা ভেঙে চুরমার করে দিল। সাঁওতালরা তাদের রুখতে পারে নি, পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তাদের আরণ্যাস্ত্র পরাভব মেনেছে। সেইদিনই তারা জেনেছে বিষাক্ত ফলকের চাইতেও আরো ভয়ানক মারণাস্ত্র আছে।

সুধীনের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পুলিশ জিনিসপত্র তছনছ করে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। বিছানার তোষক পড় পড় করে ছিঁড়ে কাগজপত্রের সন্ধান করতে লাগলো। জগদীশবাবুর ফটোগ্রাফটা বুটের নীচে পিষে দিল। খাদ্যদ্রব্য

অনেক জিনিষই নষ্ট করলো। ঘণ্টাখানেক এইভাবে বীরদর্পে তাণ্ডবনৃত্য করার পর সাম্রাজ্য-শাসকদের কর্তব্যপরায়ণ লোকগুলো প্রস্থান করলো।

নিমকের মূল্য তারা বোঝে।

সংগঠন সক্রিয়তা সব ভেঙে গেল। মনোবল হারালো মানুষ। আতংকগ্রস্ত হয়ে তারা যে যেদিকে পারলো পালালো। কংগ্রেসের শক্তি অনেকখানি কমে গেল। এবং সেই সংগে আবার দুর্ভিক্ষ বাড়তে লাগলো।

পলাশবনীতে শহর বেড়ে উঠছে দ্রুত। অগুনতি সৈন্য আসছে। মিলিটারী কণ্ট্রাক্টররা আনাগোনা করেছে। ব্যবসায়ীদের দালাল ঘুরছে চতুর্দিকে। পলাশবনীর ঘন অরণ্যের মৌন-গম্ভীর নৈঃশব্দ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে।

নোতুন জনপদ দেখা দিচ্ছে।

সেই থেকে মাঝে মাঝে পুলিশ আকস্মিক হানা দিয়ে যায় গ্রামে। যার বাড়ীতে ঢোকে, তার সর্বনাশের সীমা থাকে না। হাঁড়ি-কুড়ি বাসনপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে দেয়। বিছানা লেপ তোষক ছিঁড়ে ফাঁসিয়ে দেয়। খাদ্যদ্রব্য সযত্নে জমানো খুঁদকুড়ো উঠানে ফেলে জল ঢেলে দেয় তার উপর।

সাঁওতাল পল্লীতেও এইরকম তাণ্ডবলীলা চলে। হাঁস মুরগী ছাগল খেয়ে মেরে দেয়। মেয়েদের দেখলে অশ্লীল চীৎকার করে, ইংগিত জানায়। হাত ধরে টানে।

প্রথম প্রথম পুলিশী জুলুম সপ্তাহে একবার কি বড় জোর দুবার হতো। ক্রমে সেটা প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড়ালো। সমস্ত গাঁয়ে চলতে থাকলো অত্যাচারের স্রোত। বিভীষিকার বন্যা বইতে লাগলো। অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করলো। পুলিশ আসার খবর পেলেই লোকে বাড়ীর সমস্ত লোকজন নিয়ে বনের মধ্যে লুকতে শুরু করলো।

প্রসাদদাসের বড় ছেলেটার বউ সন্তান-সম্ভবা। হঠাৎ একদিন বনের মধ্যেই একটী সন্তান প্রসব করলো সে। অসহায় প্রসাদ, তার ছেলে চরণদাস বনের মধ্যেই ছুটাছুটি করতে থাকে। ছোট্ট একটী ছেলে—ঘাসের উপর শুয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে হাত-পা ছুঁড়ছে। আর ওদিকে

—আর পারি না গো, চরণকে ডেকে বলে রুক্মিণী।

—তুই থাম্, ঝাঁ করে জবাব দেয় চরণ। আপন মনে বকে, বিয়োবার আর সময় পেলো না মাগী!

ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে ছেলেটা। চরণ গায়ের জামা খুলে ছেলেটাকে জড়িয়ে দেয়। তারপর খালি গায়ে বসে মশা তাড়ায়। বুড়ো প্রসাদদাস ওপাশে গম্ভীর মুখে বসে থাকে চুপ করে, মাঝে মাঝে কাশে খক্‌খক্ করে।

রোদ্দুর ভালো করে আসে না। রুক্মিণী গায়ের ব্যথায় ককিয়ে ওঠে, চরণদাস তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দেয়।

সকলেরই ওই অবস্থা। পেটে ভাত নেই, গাঁটের কড়ি নেই। পুলিশকে রুখবার তেজ কমে এলো আস্তে আস্তে।

নিধু কোবরেজ বল্লে, স্পষ্টাস্পষ্টি আজ বলে দেবো—আসুক পুলিশ। আর সহ্য হয় না। বেশ ছিলাম, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কিনা!

ইন্দুমতী দাওয়ার কোণায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। নিধু কোবরেজের কথা তার কানে যায় নি, সে ভাবছিল গাঁয়ের লোকগুলির কথা। কি উৎসাহ উত্তেজনা আর আশা নিয়ে তারা ঝাপিয়ে পড়েছিল, সব নিভে গেছে আজ। সবাই আজ ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবছে। কিন্তু কেউ ভাবছে না: তাদের কথা, যারা ফাঁসির রংগমঞ্চে জীবনের জয়গান গাইতে চলেছে। দু মুঠো অন্ন, নিরাপদ বিশ্রাম পাবার জন্য সবাই যেন হন্যে হয়ে উঠেছে।

ইন্দুমতীর দিকে চেয়ে নিধু বলতে লাগলো, বলবো আজ পুলিশকে আমাদের

কোনো অপরাধই নেই। ওই সুধীনই তো সমস্ত গাঁ-কে খুঁচিয়ে বেড়াচ্ছে। বুঝলে গা, সত্যি কথাই বলে দেবো। কেন আমরা শুধু শুধু ভুগে মরতে যাই ?

ইন্দুমতী চোখ কটমট করে স্বামীর দিকে চাইলো, তারপর ইচ্ছা করেই কোনো কথা না বলে। ঘরের মধ্যে চলে এলো। তার ভয়ানক রাগ হতে লাগলো স্বামীর উপর, সমস্ত গ্রামের উপর। লোকগুলো কি ? যাদের জন্যে ওরা চোরের মত গা-ঢাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত আরাম বিলাস উপেক্ষা করে অন্ধকারে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, চল্লিশ কোটি শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তির জন্য যারা নিজের প্রাণ স্বেচ্ছায় বলি দিচ্ছে, এ মানুষগুলো কি রকম ? সাধারণ কৃতজ্ঞতাও কি নেই এদের ?

ইন্দুমতী ছুটে এসে বল্ল, তোমার লজ্জা করে না ওকথা বলতে ? সুখের লালসা তোমাকে এতটা নীচু করেছে যে মানুষের মহত্ত্বের দাম বোঝবার ক্ষমতা একবিন্দুও তোমার নেই।

নিধু এতটা আশা করে নি। একটু অবাক হয়ে গেল সে। সে ভেবেছিল দুঃখকষ্ট-আতংকে ইন্দুমতীও বোধ হয় অবস্থার পরিবর্তন চায়, তার মনের কথাও হয় তো তারই মত। একটু চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি চাও না আমাদের আগেকার নিশ্চিন্ত জীবন ফিরে আসুক ?

—না, আমি চাই না, ঝাঁঝের সংগে বল্ল ইন্দুমতী, আমি তোমাদের নিশ্চিন্ত সুখের জীবন ঘৃণা করি। মনুষ্যত্বের দাম দিয়ে সুখ ভোগের কামনা আমার নেই।" তোমাদের আমি ঘৃণা করি, তুমি জেনে রাখো, আমি ঘৃণাই করি।

মানসিক চাঞ্চল্য সংযত রাখতে পারলো না ইন্দুমতী। ফিরে এসে বিছানায় মুখ গুঁজে হুহু করে কাঁদতে লাগলো। কোবরেজ ভয়ানক অবাক হলো, ইন্দুমতীকে সে যেন নোতুন দেখছে, যেন তাকে সে নোতুন চিনলো। ইন্দুমতীর পিছু পিছু সে-ও চলে এলো ঘরে, বল্ল, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না বউ, তুমি আমায় ঘেন্না করো, সত্যি ঘেন্না করো ?

দৃপ্ত ভংগীমায় মাথা তুলে ইন্দুমতী জবাব দিল, হ্যাঁ করি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে কোবরেজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ঘর থেকে এলো দাওয়ায়, দাওয়া থেকে উঠানে। কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সেখান থেকে সে চলে এলো বাইরে। থানার পথে চল্ল কোবরেজ। সময় আছে, সুরাহা হতে পারে।

শুধু নিধু নয়, চরণদাস, কৃপাময়, রসিক, আরো অনেকে থানার পথে পা বাড়ালো। তিন মাস পরে তারা এ পথে পা দিল। নির্ভয়ে। আজ আর ভয় নেই। আজ মনে খুশির হাওয়া লেগেছে। সংঘর্ষ নয় আজ, রক্তপাত নয়, আজ বন্ধুত্ব মিত্রতার দিন।

এক এক করে সবাই গিয়ে এজাহার লিখিয়ে এলো। আন্দোলনে কেউ অংশ নেয় নি, আন্দোলনে সমর্থন নেই কারুর, গভর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করতে আগেও তারা প্রস্তুত ছিল, এখনো আছে। সরকারই তো তাদের আনুগত্য প্রকাশে বাধা দিচ্ছেন। গোলমাল করছে সুধীন রায়—জগদীশ রায়ের ছেলে, যে জগদীশ রায় জেলে মারা গিয়েছিল। তার সেই ছেলেটাই তো গণ্ডগোল পাকিয়ে বেড়াচ্ছে।

সমস্ত শুনলো সুধীন। এক মুসলমান গোয়ালার বাড়ীতে থেকে খবরটা শুনলো সে। দুঃখ করলো না, অনুশোচনা করলো না, বুঝলো জনসাধারণকে তারাই বুঝাতে পারে নি। দোষ তো তাদের নিজেদেরই।

গোয়ালে সারি সারি গরু বাঁধা। পাশেই বিচালির গাদা। তন্দ্রাহীন চোখে ঘুম আসে না। মায়ের কথা মনে পড়ে। মাকে সে আনন্দ দিতে পারলো না। অভিশাপ তারই—কেন সে দুঃখী মায়ের ছেলে হয়ে এ পথে পা বাড়ালো ?

অভিশাপ অবিশ্বাস ভীরুতার ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে চতুর্দিকে। ক্ষণিকের উদ্দীপনা তমসাবৃত জলাভূমির বুকে দপ্ করে জ্বলে-ওঠা আলেয়ার মত। পরক্ষণেই

গভীর অন্ধকার ধরিত্রীর বুক চেপে ধরে। একা নিঃসহায় সুধীন, বড় একা লাগছে, যাদের 'পরে ভরসা করে সংগ্রামে নেমেছিল, তারা সরে দাঁড়িয়েছে। কেউ নেই, সংগী নেই, অস্ত্র নেই, নিঃসংগ নিরস্ত্র সুধীন।

পৃথিবীর কান্না শুনতে পাচ্ছে অন্ধকারে। একি কান্না! ক্রমশ বেড়ে উঠছে, সুধীনের শ্বাস-প্রশ্বাস চেপে ধরতে চায় কান্নাটা, বড় করুণ, রক্ত ঝরছে যেন, তপ্ত রক্তস্রোতে পৃথিবীর বুক লাল হয়ে উঠছে, সুধীনকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চায়, সুধীনকে অন্ধকারে পিষে মারতে চায়, সুধীনের কাছ থেকে সমস্ত আলো কেড়ে নিতে চায়।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে খোলা হাওয়ায় দম নিতে সুধীন নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো বাইরে। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে নিধু কোবরেজের বাড়ীর পিছন দিকের জানলাটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালই ছিল না। অল্প দূরে সড়কের দিকে চৌকিদারের হাঁক পাওয়া গেল, পুলিশ-রাজত্ব ফের কায়েম হবার পর থেকে চৌকিদারের রাত-পাহারা আবার শুরু হয়েছে। সুধীন চমকিত হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করলো। জানলার পাশে জামরুল গাছের লুটিয়ে-পড়া শাখার অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে ডাকলো, ইন্দু!

একটী ডাকই যথেষ্ট। এই কণ্ঠস্বরের জন্যে কতদিন থেকে ইন্দুমতী প্রতীক্ষা করছে, এই কণ্ঠের আহ্বান শোনার জন্যে ইন্দুমতী কতদিন ধরে উৎসুক হয়ে আছে। গ্রামে যাকে সবাই পরিত্যাগ করেছে, বিষাদের দিনে কেউ যার মুখের পানে তাকালো না, যার আত্মগোপন অহর্নিশি স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মবলিদান, কতদিন কত রাত ইন্দুমতী তার জন্যে ব্যথানুভব করেছে, তার কৃচ্ছসাধনের ক্লেশ ইন্দুমতীকে দগ্ধ করেছে, তার অনাহার ক্ষুৎপিপাসা তাকে কাতর করেছে, তার বিনিদ্র নিশাযাপন ইন্দুমতীকে একটুও ঘুমাতে দেয় নি। ইন্দুমতী অধীর আগ্রহে কেবলি তার পদধ্বনি শুনেছে।

নিধু কোবরেজ ঘুমচ্ছে। সুধীনের ডাক টের পায় নি। স্খলিত আঁচল

বুকে জড়িয়ে ইন্দুমতী বাইরে বেরিয়ে এলো। সুধীনের সামনে দাঁড়ালো এসে। বল্লে, এসেছো তুমি? কি বলবে বলো।

—তুমি ছাড়া আমার কথা আজ আর কেউ বুঝবে না ইন্দু। কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে দেখতে পাচ্ছো তুমি?

ইন্দুমতী বল্ল, জানি, সব দেখছি। কিন্তু দমে গেলে চলবে না। নোতুন করে আন্দোলন গড়তে হবে। গান্ধীজী আজ জেলে, আন্দোলন নষ্ট হলে তিনি আমৃত্যু অনশন নেবেন। ব্যর্থতার জন্য তাঁকে যেন না হারাই।

একটু থেমে ইন্দুমতী বল্ল, দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, বন্যার মত বিপুল বেগ হবে তার। জীর্ণ আবর্জনা সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গান্ধীজীর কথা আমরা যেন না ভুলিঃ দুর্বলের বেঁচে থাকার অধিকার নেই, দেশকে স্বাধীন করবো নয়তো মরবো।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুধীন বল্ল, আন্দোলন আবার গড়ে তুলতে হলে যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাবো সে টাকা?

আমি দিচ্ছি, বলে ইন্দুমতী পট পট করে নিজের হাতের চুড়িগুলি খুলে দিল সুধীনের হাতে। গলায় সরু হার ছিল, সেটাও দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে সুধীন বল্লে, থাক ওটা। আপাতত এগুলোতেই চল্‌বে। ভবিষ্যতের জন্যে ওটা রইলো। কিন্তু তোমায় কি বলবো ইন্দু—

সুধীনের কথা শুনে ইন্দুমতী কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ রইলো। প্রশংসার প্রয়োজন আজ তার নেই। প্রশংসা তার প্রাপ্য নয়। সে যা দিয়েছে সেটা তার দান নয়, সুধীনের দাবী। ন্যায্য দাবী আদায় করে নিয়েছে সুধীন। ইন্দুমতী তার দাবীতে সাড়া তুলেছে মাত্র।

কয়েক মিনিট সে চুপ করে রইলো। সুধীনের প্রশংসা সে প্রত্যাশা করে নি। সুধীনের কথায় তার সর্বদেহে কয়েক মিনিট ধরে একটা ধীর আনন্দ-প্রবাহ বয়ে

গেল। সুধীন জবাব পাবার প্রত্যাশায় তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে ইন্দুমতী ধীর স্বরে বল্ল, শুধু বলো ঃ কমরেড।

নিধু কোবরেজের ঘুম ভেঙে গেছে। ওদের কথাবার্তার মৃদু গুঞ্জন তার কানে কম্পন তুলেছে। নিঃসাড়ে সে বেরিয়ে এলো। সুধীনের সামনে এসে বল্লে, সুধী যে! এত রাত্রে—

—বড্ডো দরকার ছিল নিধু কাকা, সুধীন কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বিস্মিত করে ইন্দুমতী কোবরেজের কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, যাচ্ছো কোথা কথা বলতে বলতে?

—যাচ্ছি কোথা? নিধু অদ্ভুত হাসলো, ছাড়ো বউ, শুতে চল্লাম। তোমাদের অভিসারে বাধা দেবো না গো। তুমি আমায় ঘেন্না করো ভুলি নি।

নিধু কোবরেজ চলে গেল। সুধীন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, ইন্দুমতীও নির্বাক। ক্ষণ পরে ইন্দুমতী বল্লে, একটু দাঁড়াও। দেখে আসি। বিশ্বাস নেই ওকে, হয়তো এখুনি কাকেও খবর দিয়ে আসবে। আন্দোলন ভাঙার জন্যে হন্যে হয়ে রয়েছে ওরা।

কোবরেজ ওদিককার দুয়ার খুলে গ্রামের পথে পা বাড়াচ্ছিল। হাতে তিন শেলের ব্যাটারী টর্চ। ছুটে গিয়ে ইন্দুমতী স্বামীর পথ রোধ করে দাঁড়ালো। হেসে বল্ল, আর যাই করো, আমার স্বামী তুমি, এত বড় শত্রুতা কিছুতেই তোমাকে করতে দেব না।

ইন্দুমতী অনেকদিন পরে এই প্রথম হাসলো স্বামীর প্রতি। পাগল হয়ে গেল কোবরেজ। বিস্মিত হয়ে স্ত্রীর পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর শেষে বল্ল, তোমার জন্যে আমি সব পারি বউ, কিন্তু তুমি আমায় সময় সময় বড্ড ঘেন্না করো। আর করবে না বলো।

স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল ইন্দুমতী। কোবরেজের

কেশবিরল মাথায় অনেকক্ষণ ধরে নরম হাত বুলিয়ে দিল। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে। এতক্ষণ সুধীন দাঁড়িয়ে আছে কি না কে জানে।

কর্মহীন স্থাণুর মত জীবন। ডাকতে গেলেও কেউ আসে না। দূর থেকে সরে যায়। রহস্যজনক গতিবিধি ওদের। আন্দোলন কি শেষ হয়ে গেল? এতদিনের এত আশা, উদ্দীপনা সব নিভে গেল?

পকেটে ইন্দুমতীর হাতের চুড়িগুলি রয়েছে, কি করবে সে এগুলি নিয়ে? আন্দোলন জীবন-শক্তি হারিয়েছে, তাঁকে বাঁচিয়ে তোলার অর্থ অক্সিজেনের সাহায্যে মুমূর্ষুকে বাঁচিয়ে রাখা।

হিরু শেখ জানালো, দাদাবাবু, ওরা বলছিলো—

—কি বলছিলো?

মাথা চুলকে হিরু শেখ বল্লে, অবস্থাপন্ন গেরস্তরা সবাই তো থানায় কবুল করে এসেছে। মুস্কিল হয়েছে গরীব চাষীদের। ওদের কথা সরকার বিশ্বেসই করতে চায় না। বলে, তোরা এ সবের শেকড়। তোরাই তো এসব করে বেড়াচ্ছিস। পুলিশের জুলুম লেগেই আছে ওদের ঘরে। আর পারে না ওরা। দিনে রাস্তার দিকে এক চোখ রেখে থাকে, রাতে বনের মধ্যে নয়তো ভিন্ গাঁয়ে যায় ঘুমতে।

—কে তোমায় একথা বল্লে হিরু?

—আমি শুনে এসেছি দাদাবাবু। হিরু উৎসাহভরে বলতে লাগলো। তার বিশ্বাস এ সব শুনলে দাদাবাবু এই রক্তের পথ ছেড়ে দেবে,—মিটিং করেছে ওরা সবাই মিলে। আঁতুড়ের ছেলে-বিয়েন নিয়ে বনের মধ্যে থাকতে পারবে না আর। না খেয়ে পুলিশের ভয়ে কদ্দিন আর এমনিভাবে কষ্ট করবে? হলোও না তো কিছু!

হলোও নাতো কিছু। সবাই ওই কথা ভাবছে। ওরা ভেবেছিল স্বরাজ বুঝি গাছের ফলের মত। গান্ধীজীর তপস্যার উত্তাপে পেকে টুসটুসে হয়ে আছে। একটু গাছ নাড়া দিলেই টুপ করে পড়বে পাকা ফল।

ভুল করেছিল সুধীন। ভালো করে সচেতন করতে পারে নি ওদের। শিথিল ভিত্তির উপর এতটা উত্তেজনা নিয়ে আসা উচিত হয় নি।

প্রাণের মত ভালোবাসতো যারা, প্রায় সবাই তারা সরে পড়েছে। গরীব দুঃখী কয়েকজন, দুর্ভিক্ষে-লড়াইয়ে পরাধীনতার বাস্তব নিষ্পেষণ যাদের গলায় মৃত্যুর ফাঁস পরিয়ে দেয়, তারা সরে না পড়লেও এগিয়ে আসতে পারছে না। দুশো বছরের ভাঙা মেরুদণ্ডের প্ল্যাষ্টার দেওয়া জোড়—অল্প উত্তেজনার ধাক্কা সইতে না পেরে ফের খুলে গেছে।

পরাজয়ের শুধু পরাজয়েরই আনন্দ করছে ওরা ওই কৃপাময় বিশ্বাস, রসিক সামন্ত, পরাণ মণ্ডল, নিধু কোবরেজ, সামান্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা। আন্দোলন একেবারে থামলে তারা বাঁচে।

সুধীন একটু চুপ করে থেকে বল্লে, তাই যদি তোমাদের মনের কথা হয়, তাহলে বুঝবো আন্দোলন শেষ হলো। তাহলে কেন এই চোরের মত লুকিয়ে থাকা তোমাদের বিপন্ন করা? ধরা দেবো আমরা। তোমরা সুখে থাকো হিরু, তোমাদের জন্যেই আমরা সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নেমেছিলাম, তোমরা যদি না চাও, কাজ করবো কাদের নিয়ে?

হিরুর চোখে জল। হিরু শেখ কাঁদছে। সুধীনবাবু, তাদের দুঃখের সমব্যথী, বিপদের দিনের বন্ধু দরদী দাদাবাবু চলে যাচ্ছে ধরা দিতে। এ দুঃখ সে কিছুতেই সইতে পারছে না।

চোখ মুছে সে বল্ল, তোমার কাছে একটা কথা দাদাবাবু, আমার অপরাধ নিও না। আল্লার কসম, আর কেউ আসুক না আসুক, আমি তোমার সংগে

রইলাম। তুমি কোলকেতার পড়াশুনো ছেড়ে বুড়ো মাকে ফেলে এতদুঃখু কষ্ট সহ্য করছো—আমরা কি মানুষ নই দাদাবাবু ?

সুধীন বল্লে, মহকুমার সমস্ত কর্মীদের সংগে আরেকবার পরামর্শ করতে হবে। রমেশবাবুকে তুমি খবর দিও হিরু।

সেনহাটির ভাঙা শিবমন্দিরে মিটিং। কাঁকনতলা থেকে সেখানে যাবার একটী মাত্র পথ লোকাল বোর্ডের সড়ক। সড়কের দুপাশের মাঠে গাছপালা সাফ করে সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে। রাইফেল নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আছে ওরা। হুকুম দেওয়া আছে গ্রামবাসীদের একটু বেয়াড়াপনা দেখলেই গুলি চালাবে।

ওপথ দিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। প্রকাশ্যে ওভাবে যাওয়া যায় না। হিরু শেখ ও আরো দুজন অচেনা কৃষক বনের মধ্য দিয়ে গোপন পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ল সুধীনকে। অদূরে সৈন্যপরিবেষ্টনী। তারই মধ্য দিয়ে অজানা কৃষকবন্ধুদের নির্ভুল সংকেতে অক্ষতদেহে সেনহাটির ভাঙা শিবমন্দিরে এসে গেল সুধীন।

দুচারজন কৃষক-কর্মী এসেছে। রমেশ মুখুজ্যে ও অন্যান্য নেতারা এখনো আসেন নি। ২নং ইউনিয়নের কর্মী শীতল জানা এসেছে। সে বল্ল, আর কিছুদিন লুকিয়ে থাকা যাক। অবস্থা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিক না হলে ফের আন্দোলন করা যাবে না।

৪নং ইউনিয়ন থেকে এসেছে শিবু দলুই। সে স্পষ্টই বলে দিল, আর পারা যায় না সুধীনবাবু। অন্য কোথাও চলে গেলে হয়।

সেই চোরের মত গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। কাজ নেই, আন্দোলন নেই, মানুষের বিশ্বাস নেই। কর্মীদের নিজেদের আশা নেই, গ্রামে গ্রামে ঘুরছে সরকারের গুপ্তচর। লোকমুখে কর্মীদের গতিবিধির যেটুকু খবর পাচ্ছে, তাই কাজে লাগাচ্ছে। ধরা দিতেই হবে, নইলে গাঁয়ের লোকেই ধরিয়ে দেবে। দেশের লোক পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবে এ লজ্জা তারা রাখবে কোথায় ?

শীতল জানা শিবু দলুইয়ের মুখে বীর্যহীন নিরাশা। ওরা সুস্পষ্ট নোটিশ দিতে চায়।

রমেশ মুখুজ্যেরা এলেন। সুধীন দৃঢ়তার সংগে বল্লে, ধরাই দেওয়া উচিত আমাদের। দেশের লোক যদি এই আন্দোলন না চায়, একে যদি ওরা নিজেদের মুক্তি-সংগ্রাম বলে গ্রহণ না করে, তবে কি হবে এই আন্দোলনে? আন্দোলন চলবেই বা কাদের নিয়ে?

সবাই একমত হলো। ধরাই দিতে হবে। ধরা না দেওয়া পর্যন্ত জনসাধারণের উপর পুলিশের জুলুম চলতেই থাকবে। জনসাধাণের আর্ত পিঠের উপর অত্যাচারের বোঝা চাপালে কংগ্রেসের প্রতি ওদের একটা বিজাতীয় ঘৃণা এসে যাবে। তা হয় না। করেংগে ইয়া মরেংগে—দেশকে স্বাধীন করবো নয়তো মরবো। অন্ধকারার মৃত্যু-গুহাই বাঞ্ছনীয়।

ধরা দেবার দিনও স্থির হয়ে গেল।

অন্ধকার ঘরে টিম টিম করে প্রদীপ জ্বলছে। কম্বল বিছিয়ে চৌকিতে শুয়ে আছেন সুপ্রভা কাজলী হিরণ্ময়ী। সুধীনের চলে যাবার পর থেকে সুপ্রভার রোজ জ্বর হয়। হিরণ্ময়ী ও কাজলী দেখাশোনা করেন। সংসারের কাজে সুপ্রভার আর কোনো উৎসাহই নেই। কার জন্যই বা সংসার? কটা দিনই বা বাকি আছে জীবনের? সুধীন চলে গিয়ে অন্ধকার করে দিয়েছে সব—সংসার, ঘর দোর জীবন। দুঃখের পৃথিবীতে আলো আনতে গিয়েছে সে; কিন্তু সুপ্রভার জীবনের সান্ত্বনা সব শেষ। শূন্য লাগে হৃদয়, যে হৃদয় একদিন সুধীন ভরে রেখেছিল। খালি হয়ে আসে বুকটা, যে বুক একদিন সুধীন পূর্ণ করে রেখেছিল।

গুমরে গুমরে শেষে একদিন জ্বর হলো। সেই থেকে জ্বরটা রোজ আসে। দিনের বেলা জ্বরটা থাকে না প্রায়ই, রাত্রের দিকে হয়। হিরণ্ময়ী সর্বদাই থাকেন

সুপ্রভার কাছে। সুপ্রভাকে মেয়ের মত দেখাশোনা করেন। সুপ্রভাকে তিনি বড় ভালোবাসেন।

হিরণ্ময়ীর মধ্যে লুকিয়ে আছে আগেকার যুগের এক স্বাধীন বীরাংগনা মহিলা। তাঁর প্রপিতামহ সিপাহী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বীর সিপাহীর নীল রক্ত তিন পুরুষ ধরে চলে এসেছে হিরণ্ময়ীর দীর্ঘাকৃতি সুশ্রী দেহে। হিরণ্ময়ীর বাবা হিন্দু মেলায় বক্তৃতা দিতেন—হিরণ্ময়ী বাপের কাছ থেকেই দেশের কথা, সিপাহী যুদ্ধের কথা শুনতেন। সৈনিক প্রপিতামহের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর কাহিনী তাঁর কিশোর মনে দোলা জাগাতো। উত্তেজনায় তাঁর কচি গালে তপ্ত রক্তস্রোত রাঙা হয়ে উঠতো, পিংগল চুলে আসতো রোমাঞ্চ।

সেই হিরণ্ময়ী। কৈশোরের রোমাঞ্চ অতিক্রান্ত। যৌবনের স্বর্ণাভ উর্মিমুখর দিনগুলো আজ বোধ হয় স্বপ্নের মত মনে পড়ে। ঝড়-ঝাপটা জীবনে এসেছে, তবু রক্তের সংগে মেশা বিদ্রোহের ইতিহাস আজো তাঁর মনকে নিঃশব্দে বিদ্রোহী করে তোলে। সিপাহী যুদ্ধ, হিন্দুমেলা, বংগভংগ—মনে পড়ে হিরণ্ময়ীর: দূর গ্রামের মহাজনদের আড়তে ধান বিক্রী শেষ করে বিকেলে বাড়ী এলেন স্বামী রতিকান্ত। হিরণ্ময়ী তখন সবেমাত্র উঠানের তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিতে আসছেন। সন্ধ্যা তখন হবো হবো। আজ স্বামীর ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে তিনি বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় এসে হাজির হলেন তিনি। কি প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল তাঁকে, ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। সহাস্যমুখে বল্লেন, দাঁড়াও—হিরণ্ময়ী তাড়াতাড়ি তুলসীমঞ্চে প্রদীপ নামিয়ে প্রণাম সেরে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সম্মুখে। রতিকান্ত হিরণ্ময়ীকে বল্লেন, আজ রাখীবন্ধনের দিন। বাংলাকে ভাঙবে বলেছে ইংরেজরা। কত রাখী পরিয়ে দিয়েছে দেখেছো, হিরণ্ময়ী দেখলেন স্বামীর বলিষ্ঠ হাত অসংখ্য রাখীতে ভরে উঠেছে। গ্রামের সবাইকে রাখী পরাতে চলে গেলেন রতিকান্ত—ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখতে। তখন হিরণ্ময়ীর কতই বা বয়স।

কি উত্তেজনা সেদিন। কি একটা স্নিগ্ধ আনন্দের প্রলেপ বয়ে গিয়েছিল হিরণ্ময়ীর মনে। উপবাসের দিন ছিল সেদিন। সবাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিল: এদেশ আমার, এর সহস্র ভুল নিয়ে, সহস্র ত্রুটি নিয়ে, সহস্র বিরোধ নিয়েও এদেশ আমার। আমরা সবাই ভাই-ভাই।

সেই হিরণ্ময়ী। পক্ক কেশ বৃদ্ধা। অভাব অনটনের সংসার। ক্ষুদ্র কুটির। স্বাধীনতার ছায়াসমন্বিতা একটী প্রৌঢ় বট। উত্থান-পতন-বিপর্যয়ের স্তব্ধ-দর্শিকা। তবু হিরণ্ময়ী ভাঙেন নি। নীল রক্তস্রোতে আজও ক্ষীণ ধারায় পূর্বপুরুষ সৈনিকের রক্ত বইছে।

সুপ্রভাকে তিনি ভালবাসেন। জগদীশবাবু বয়সে অনেক ছোট হলেও তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। আর সুধীনকে তিনি স্নেহ করেন। তাঁর চোখের সামনে এই পরিবারটী গড়ে উঠেছে, এ যেন তাঁর নিজের সংসার। তিনি যেন এদের অভিভাবক।

রাত্রে তিনজন একত্র থাকেন। সুপ্রভা যেন তাঁর মেয়ে। সুপ্রভাকে তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিরাট পক্ষপুটে আবৃত করে রাখতে চান—কঠিন শক্তিময় পক্ষপুট ঝড় ঝাপটা সহ্য করে অটুট আছে। সুপ্রভাকে ভেঙে পড়লে চলবে না।

বাতাসে প্রদীপ শিখা নিভে যেতে যেতেও ফের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তন্দ্রা থেকে উঠে সুপ্রভা হিরণ্ময়ীকে ডেকে বল্লেন, মা—

—কি মা, হিরণ্ময়ী সাড়া দেন।

—বুকটা বড্ড ধড় ফড় করছে, কেন এমন করে মা?

—সুধীনের কথা বড্ড ভাবিস তুই। সে ভালো আছে, ঘুমো, হিরণ্ময়ী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

সুধীনের কথা সুপ্রভা ভুলে যেতে চান। কিন্তু ভুলে যাওয়ার প্রয়াস তাঁকে আরো বেশী করে পুত্রের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বুকটা শূন্য লাগে, বুকের মধ্যে

যেন কিছু নেই, কল্‌জে হৃদয় কিছুই নেই। শুধু আছে এক শূন্যতার হাহাকার।

ঘুমন্ত কাজলীকে ডেকে তোলেন,—বুকটায় হাতটা চেপে ধরতো, বড্ড ধড় ফড় করছে।

ইন্দুমতীর সংগে নিধু কোবরেজের ঝগড়া বেঁধে যায়।

চীৎকার করে ওঠে কোবরেজঃ গয়নাগুলো ঘুচিয়েছিস সব? দাওয়ায় পা ছড়িয়ে মেয়েদের মত কাঁদতে বসে কবরেজঃ কি সব্বনাশ হলো গো আমার, আমি কোথায় যাবো গো এখন?

অদ্ভুত অপরূপ ভংগীতে সে কাঁদতে থাকে। পঞ্চাশ বছরের বুড়োকে দাওয়ায় পা ছড়িয়ে স্বর করে কাঁদতে দেখে ইন্দুমতী হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ফেলে। তাকে হাসতে দেখে নিধু কোবরেজের কান্না থেমে যায়। সে মনে করে গহনাগুলো ইন্দুমতী কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। দুর্ভিক্ষের দিনে পাছে শেষ অলংকারগুলিও যায়, সেই ভয়ে সে তাকে দিচ্ছে না।

ছেলেমানুষের মত হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে নিধু ইন্দুমতীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়ঃ

বল্‌না লক্ষ্মীটী, কোথায় আছে সেগুলো?

ইন্দুমতী তাকে একটা আকস্মিক ধমকানি দেয়ঃ ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমায়। লজ্জা করে না কাছে আসতে?

কাল রাত্রে কোবরেজ হাঁড়ি পাড়া থেকে মদ খেয়ে এসেছিল। ইন্দুমতী তারই ইংগিত দিল। কিন্তু কোবরেজের লজ্জা পাওয়া দূরে থাক. সে তার আরো কাছে আসার চেষ্টা করলো। বল্লে, বিয়ে করা স্ত্রী, লজ্জা কিসের আমার?

কুৎসিৎ মুখটা আরো কুৎসিৎ ভাবে ভেংচে বল্লে কোবরেজ, ভারী আমার শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে, আমি না করলে তো বিয়ে হতো না, ত্যামাক তখন থাকতো কোথায় শুনি?

ইন্দুমতী চোখ পাকিয়ে বল্লে, মুখে আগুন তোমার! বুড়ো বয়সে পচা মদ খেতে লজ্জা হয় না? বলে তেড়ে গেল সে।

ইন্দুমতীর আক্রমণের ভংগী দেখে ভয় পায় নিধু। সাহস হয় না, কি জানি এই শহুরে মেয়েটা তার ভালো-না-লাগা বুড়োকে ক্যাক করে যদি গলা টিপে শেষ করে দেয়।

অতি নরম হয়ে নিধু বল্লে, রাগ করো না বউ, তুমি আমায় ঘেন্না করো জানি, কিন্তু আকালের দিনের ভরসা সোনার চুড়িগুলো যে কটা বাকি ছিল, কোথায় রেখেছ বলবে না?

এই নাও, বলে ইন্দুমতী গলার সরু হারটা খুলে দেয় ওকে। লকেটটা রোদ্দুরে চিকচিক করে।—এইটাই ছিল শুধু, নাও তুমি। আর আমায় বিরক্ত করো না।

নিধু হতভম্ব হয়ে যায়। বলে, চুড়িগুলো? আমার মাথার দিব্যি, তোমার এয়োতির দিব্যি, সত্যি কথা বলো।

স্বামীর দিব্যি-দেওয়ার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, তা ইন্দুমতীকে স্পর্শ করে। ধীরে ধীরে তার মুখের ভাব বদলে যায়। দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য সামনে টাঙানো লোহার তারটা ধরে শূন্য দৃষ্টিতে শান্ত স্বরে জবাব দেয়ঃ সেগুলো আমি সুধীনকে দিয়েছি।

—সুধীনকে দিয়েছো? নিধু কোবরেজের কণ্ঠস্বর গভীর হতাশায় বসে যায়। থর থর করে সে কাঁপে। বার্ধক্যের জরা যেন তাকে গ্রাস করে। একটা প্রবল শক্তি যেন তাকে মাটিতে শক্ত করে বসিয়ে রাখে, উঠতে দেয় না। সোনা, দুর্ভিক্ষের দিনের সোনা ইন্দুমতী নিজের হাতে বিলিয়ে দিয়েছে।

ইন্দুমতী স্তব্ধ হয়ে চলে যায় ঘরে। নিধু কোবরেজ হতবাক বিহ্বল হয়ে দাওয়ায় বসে থাকে। কিছু বলার কিছু করার শক্তি যেন আজ তার হারিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের ছায়া গ্রামে করাল মূর্তিতে ঘনিয়ে উঠেছে। লোভী মানুষের দল বুভুক্ষু মানবের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে। সহায় নেই সম্বল নেই উপার্জন নেই,

নিধু কোবরেজকে দেখবে কে ? অন্নহীন আহার্যহীন খাদ্যহীন রাজ্যে বিত্তহীন শক্তিহীন বৃদ্ধ নিধু কোবরেজের কে অন্নের সংস্থান করবে ?

চোখের সামনে অনাগত বিভীষিকার ছায়া দেখতে পায় কোবরেজ। আতংকে সে শিউরে ওঠে। গভীর নৈরাশ্যে সে মাটিতে আরো নুয়ে পড়ে। সে আজ পংগু হয়ে গেছে। ইন্দুমতী—যৌবনশালিনী নারী, তার ভয় কি ? মন্বন্তর তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। সে চলে গেছে ঘরে।

কিন্তু নিধু পরক্ষণেই গভীর হতাশার মধ্যেও আশার আলো দেখতে পায়। চোখ দুটো তার হঠাৎ অস্বাভাবিক দ্যুতিতে জ্বলে ওঠে। মত্ত হস্তির মত শক্তি ফিরে পায় বৃদ্ধ। ছুটে বাইরে চলে যায় চেঁচাতে চেঁচাতে : আমি পুলিশে খবর দেবো, আমি পুলিশে খবর দেবো।

কিন্তু পুলিশে আর খবর দেওয়া হয় না। জনতার ভিড়ে সে থমকে দাঁড়ায়।

সবাই শুনেছে খবরটা ! আন্দোলনের কর্মীরা সবাই একসংগে ধরা দিয়েছে। রমেশ মুখুজ্যে, শিবু দলুই, শীতল জানা, সুধীন রায়, অন্যান্য ইউনিয়নের অসংখ্য কর্মীরা—সবাই গ্রেফ্তার হয়েছে। আন্দোলনের যবনিকাপাত হলো এতদিনে।

ইন্দুমতী বালিশে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার আর কেউ রইলো না। এ গ্রামে আর কেউ তাকে বুঝবে না। আর কেউ তাকে জানবে না। তার জীবনের সীমাহীন শেষহীন যাত্রায় সে পেয়েছিল একটী সংগী একটী দরদী সাথী। দিকহারা নামহীন সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছিল সে, বন্দরের দেখা পেয়েও নোঙর করতে পারলো না। দুঃখ-সাহারায় একটী মরূদ্যান দেখা দিয়েছিল, শূন্যে মিলিয়ে গেল। তার জীবনের অনুর্বর মৃত্তিকায় জেগেছিল একটী কিশলয়, তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল ইন্দুমতী। পারলো না। কেউ তাকে বুঝবে না।

কেউ তাকে জানবে না। কাঁকনতলার অন্ধকার জলাভূমি তাকে নিঃশব্দে গ্রাস করবে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে। কান্নার আবেগে তার ফুলের মত নরম দেহ বার বার দুলে দুলে উঠছিল। নিধু কোবরেজ দরজার বাইরে থেকে কটমট চোখে সেদিকে চেয়ে মনে মনে ভাবছিল সুধীনের কাছ থেকে গহনাগুলো উদ্ধার করবার জন্য পুলিশের কাছে কি বলা যায়। গহনাগুলো সুধীনের কাছে আছে কিনা কে জানে।

একটা মর্মান্তিক আক্রোশে কোবরেজ ইন্দুমতীর ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত দেহের দিকে রোশকশায়িত দৃষ্টিতে চেয়েছিল।

সকাল থেকেই সুপ্রভার ভয়ানক বাড়াবাড়ি অবস্থা। কাজলী সমানে তাঁর শুশ্রূষা করছে। ওইটুকু মেয়ে, তবু সুধীদার মাকে সে বাঁচিয়ে তুলবে প্রতিজ্ঞা করেছে। হিরণ্ময়ী কেবলি দেখাশোনা করছেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ জোগাড় করে এনে দিয়েছেন। কিন্তু সুপ্রভার কষ্টের লাঘব হয় নি। কেবলি সংজ্ঞালোপ হচ্ছে।

অচৈতন্যের মত পড়ে আছেন তিনি। সুন্দর সুশ্রী কপালে ঘনিয়ে আছে ছেলের জন্য বিরামহীন ক্লান্তিহীন উৎকণ্ঠা। কপালের দুধারের অল্প রুপালি চুলে মাতৃত্বের কি সুন্দর বিন্যাস। চোখ থেকে দুগাল বেয়ে বাৎসল্যের ক্ষীণধারা বইছে।

গ্রেফ্‌তারের খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই শুনেছে। কাজলীও শুনেছে, হিরণ্ময়ীও শুনেছেন। সুপ্রভাকে বলা হয় নি।

বিছানার সংগে মিশে আছেন সুপ্রভা। ক্লান্ত নিঃসংগ যাত্রীর মত। হঠাৎ চোখ মেলে সুপ্রভা বলে উঠলেন : দাঁড়াও, আমিও যাবো—

কাজলী ঝুঁকে পড়ে ডাকলো, মা, মা!

সুপ্রভার দেহ কঠিন হয়ে এলো। কোনো স্পন্দন জাগলো না। শান্ত স্তব্ধ দেহ শূন্যতাকে আরো স্পষ্টোচ্চারিত করে তুল্ল। হিরণ্ময়ী চোখে কাপড় দিলেন, কাজলী ডুকরে কেঁদে উঠলো। কিন্তু জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম করে যে জীবন যে দেহ এতদিন সংবেদনশীল হয়ে ছিল, সে আর কিছুই বল্লে না। এ জীবনের জীবনব্যাপী সংগ্রাম তার এতদিনে শেষ হলো।

—চার—

অগ্রহায়নের গোড়াতেই কাজলীর বাবা ও মা মেয়েকে নিয়ে গেলেন কর্মক্ষেত্রে। জমিদারের সেরেস্তায় সেখানে কর্মচারীদের পরিবারের জন্য দুমুঠো খাদ্য মিলবে।

জনশূন্য হয়ে উঠছে কাঁকনতলা—এমনি করে অনেকেই চলে যাচ্ছে। যারা রয়ে যাচ্ছে মৃত্যু তাদের উপহাস করছে।

চলে গেছেন হিরণ্ময়ী কাজলী; চলে গেছেন সুপ্রভা সুধীন; চলে গেল ইন্দুমতী—তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। অনাহারে না খেয়ে নিধু কোবরেজ মারা গেছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইন্দুমতী তাকে বাঁচাবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেছিল, তার মুমূর্ষু মুখের মৃত্যুকাতর শূন্যতায় জলের বিন্দু দিয়েছিল, তবু সে বাঁচলো না। কেউ জানে না ইন্দুমতী কোথায় গেছে, কে-ই বা রাখবে সে খবর এখন?

শুধু মরণ, মরণ তার মৃত্যু-বাসর রচনা করেছে গ্রামে। নববধূর মত নিঃশব্দে এসেছিল সে, কেউ টের পায় নি। ঘুমের তিলক পরিয়ে মরণ নিশ্চিন্তে তার অভিসার রমণীয় করেছে।

হাঁড়ি-পাড়ার মেয়ে রুক্মিণীর দু মাস আগেকার ছেলেটা মরে গেছে। প্রসাদ দাস তার নাতিকে বাঁচাতে পারলো না। চরণ তার পুত্রকে আটকাতে পারলো না। দুধের অভাবে শিশুটা মারা গেল।

কোথায় পাবে দুধ? একদিন তাদের অভাব ছিল না বটে। সেদিন প্রসাদ দাস দু হাতে রোজগার করেছে। মদ যা তৈরী করতো—এ তল্লাটে তার মত ওস্তাদ কেউ ছিল না। ভিন্ গাঁ থেকে লোক আসতো মদ কিনতে।

সে সব আলো-ঝলোমল দিন। বুড়ো প্রসাদদাসের সে সব কথা বোধ হয় ভালো মনেও নেই, কারণ সে সব প্রসাদ ভাবতে পারে না, ভাবতে চায়ও না। সে সব কথা মনে পড়লেই সে ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়ে, বড্ড ধড়ফড় করে বুক।

আঃ! দু চোখ ভরে জল আসে। বেদনায় টন টন করে বুক। একটী ভাঁটিখানা ছিল তার। ফুটন্ত মহুয়া রসের মত্ত সুরভি উজ্জ্বল আকাশের এলোমেলো বাতাসকে ভারী করে তুলতো। লোকে বলে নাকি রাত্রে ভালুক এসে ঘুরে বেড়াতো ভাঁটিখানার চারপাশে। মহকুমা শহর থেকে এক বাবু আসতো প্রসাদের কাছে। নোট ফেলে ভরা বোতল নিয়ে যেতো। ভারী সুন্দর দেখতে ছিল বাবুকে। জমকালো পোষাক পরে বাবু আসতো। আঙুলে ঝকমক করতো হীরার আংটি। কথা কইবার সময় কয়েকটা সোনার দাঁত দেখা যেতো। ভাঁটি-খানার অন্যান্য বাজে লোকের ভিড়ে বসতো না বাবু। প্রসাদদাসের খোলা উঠোনে পুষ্পিত মহুয়া গাছের নীচে ফাগুনের ফুরফুরে হাওয়ায় বেতের মোড়া পেতে বসে থাকতো বাবু। কত গল্প করতো প্রসাদের সংগে। বেহুলা, প্রসাদ দাসের বউ, শূয়োরগুলোকে খাওয়াবার জন্যে মাঝে মাঝে বাইরে আসতো। রাত একটু বাড়লে তাদের বাইরে থেকে তাড়িয়ে এনে খোঁয়াড়ে তুলতো।

প্রায় রোজই আসতো বাবু। আসার সময়ের স্থিরতা ছিল না। প্রসাদ থাকতো না অনেক সময়। হয় তো হাটে যেতো মহুয়া ফুল কিনতে। বাবু বসে বসে অপেক্ষা করতো। বেহুলার সংগে গল্প করতো।

তারপর একদিন বাবু আর এলো না। বেহুলাকেও আর দেখতে পাওয়া গেল না। কত ছুটাছুটি কত সন্ধান করে বেড়ালো প্রসাদ, পাত্তা মিল্‌লো না।

আর সেই থেকেই সে মদ তৈরী ছেড়ে দিল। ওতে মানুষকে মাতাল করে, হৃদয়ের কোনো মূল্য থাকে না।

গরু কিনেছিল প্রসাদ। বেহুলার বাচ্ছাকে দুধ খাওয়াতে হবে। পশ্চিমী গরু, দুধ দিতো অনেক। চরণ বলিষ্ঠ দেহ পেয়েছে সেই গরুটার দুগ্ধে। মায়ের দুধ সে আর পেলো কই? এক বছরের মাথায়ই তো বেহুলা ছেলেটাকে ফেলে গিয়েছিল।

সেই প্রসাদদাস, তার বংশধর দুধের অভাবে মরে গেল। রুক্মিণীর বুকে দুধ ছিল না। পাকিয়ে টিপে ধরতো শিশুর মুখে, এক ফোঁটা পান্‌শা দুধ হয়তো বেরিয়ে আসতো। দুধের শিশুকে বাঁচাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না ওই দুধ। শুকিয়ে মরে গেল ছেলেটা।

ভালোই হলো। শীর্ণ শিশুকে জোর করে বাঁচাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মলিন দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পেলো ওরা। বাঁচলো রুক্মিণী। ওর বুকে ব্যথা ধরে গিয়েছিল।

কদিন পরে চরণদাস বাড়ী ছেড়ে বেরুলো। যাবার আগে বাপকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল এক সপ্তার মধ্যে কিছু একটা কাজ সংগ্রহ করে বাড়ী ফিরবে। দুর্ভিক্ষের দিনে এমনি করে পরিবারের মৃত্যু সে কিছুতেই দেখতে পারবে না।

এক সপ্তা ছেড়ে এক মাস হয়ে গেল, ফিরে এলো না চরণ। প্রসাদ তখন রীতিমত ধুঁকছে। খবর পেয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার পরেশ হাজারী দেখতে এলো। তরুণ ডাক্তার। শহর থেকে নোতুন এসেছে। প্রসাদদাসের শুকনো ঘাস-ওঠা মাঠের মত বুকে স্টেথস্‌কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করছিল, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো রুক্মিণী। প্রসাদদাসের অসুখের দাওয়াই বাংলাতে গিয়ে অন্ধকার

দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রুক্মিণীর কাছে পরেশ ডাক্তার তাদের খাদ্যসমস্যার দাওয়াই বাতলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত ভংগী করে সরে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা।

মরলো প্রসাদ। রুক্মিণীর চোখের সামনে তিল তিল করে অনশনে বহুকষ্ট পেয়ে এক সময় চোখ বুজলো বুড়ো। রুক্মিণী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। পরেশ ডাক্তার তাকে বলেছিল, রোজগার করে বুড়ো শ্বশুরকে বাঁচাতে পারিস না ?

সুবর্ণর দাদা প্রদীপকে ক্ষিতীশবাবু বিলেতে পাঠালেন। টেক্‌নিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবার জন্য। বেভিন স্কীমের ছাত্র হয়ে প্রদীপ ভারতবর্ষ ছেড়ে চল্ল লণ্ডনে। পুত্রের বৈদেশিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরে ক্ষিতীশবাবু খুশিই হলেন। এবার মেয়ের সম্বন্ধে একটা কিছু করতে পারলে হয় অর্থাৎ তার বিয়ের ব্যবস্থা। তবে সে বিষয়েও তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, মনে মনে একটি পাত্র ঠিক করে ফেলেছেন।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে সুবর্ণর বাবা স্ত্রীকে বলছিলেন, চালের দর হু হু করে বাড়ছে। কিছু চাল আনিয়ে নিই কি বলো।

হ্যা, কিছু বেশী আনিয়ে রাখো, সুবর্ণর মা বল্লেন, দুর্ভিক্ষ যখন হয়েছে একবার, আরো তো বাড়বে।

সুবর্ণর বাবা বল্লেন, বাড়বে, খুব বাড়বে। এতো বাড়বে যে সাধারণ লোকে কিনতে পারবে না। অপূর্ব বলছিলো সেকথা। ও-ই তো একটা চালের

কারবার ফেঁদেছে গো। ভারী চালাক ছেলেটী, সময় বুঝে ব্যবসায় নেমেছে। দেখে নিও এ থেকে সে লাখ টাকা করে নেবে।

তার পরদিনই চুপি চুপি পঁচিশ মন চাল এসে গেলো এ বাড়ীতে। অপূর্ব নিজে এলো চেক নিতে।

স্ববর্ণর সংগে সেইদিনই প্রথম আলাপ হয় তার। আলাপ করে অপূর্ব খুশিই হয়েছিল স্ববর্ণর খুশির অপেক্ষা না রেখেই। এবং সেই থেকে সে প্রায় প্রত্যহই মোটর হাঁকিয়ে আসে এ বাড়ীতে। উদ্দেশ্য বাহ্যত ক্ষিতীশবাবুর সংগে বিজ্‌নেস টক্, ন্যায়ত সেটা স্ববর্ণর সান্নিধ্য-যাঞ্চা।

সেদিন স্ববর্ণর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়েছিল লোকটা। স্ববর্ণ তাকে পছন্দ করে না। লোকটা স্মার্ট হলেও তার অন্তরংগ হবার প্রয়াস দেখে স্ববর্ণর বিরক্তি লাগে, হাসিও পায়।

স্ববর্ণের মৌনতা ও ঔদাসিন্য লক্ষ্য করে অপূর্ব বলেছিল, দেখুন মিস চৌধুরী, চালের কারবার করি বলে সোস্যাল নই এমন আমাকে মনে করবেন না।

অপূর্বর কথার ধরণে স্ববর্ণ হেসে ফেলেছিল, ঘটা করে সে কথা প্রচার করছেন ?

—প্রচার নয়, তবে আপনাকে জানানো, কোটের কলারে হাত বুলাতে বুলাতে জবাব দিয়েছিল অপূর্ব।

স্ববর্ণর বইগুলো ঘাঁটছিল সে। কি বিরক্তি লাগছিল তার। লোকটা বইগুলো ঠিকমত ধরতেও জানে না। নোটের খাতাটাও ওল্‌টাচ্ছে। কি অভদ্র !

—বাঃ, কি স্থন্দর লেখা আপনার ! মুগ্ধ হয়ে অপূর্ব মন্তব্য করলো।

—ওটা আমার লেখা নয়, স্ববর্ণ সত্য কথা বলে লোকটাকে আহত করবার চেষ্টা করলো, আমার টিউটরের লেখা ওটি।

—আপনার টিউটর ?

স্বর্ণ জবাব দিল, হ্যাঁ, কিছুদিন আগে আমাকে পড়াতেন। এখানকার ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্র ছিলেন।

হুঁম্! স্বর্ণের শ্রদ্ধামিশ্রিত কথার স্বরে অপূর্ব বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারলো না। স্বর্ণর কথাগুলো তার মনঃপুত হলো না। সে জিজ্ঞাসা করলো, কি করেন এখন ?

স্বর্ণ জানালো, রাজনীতি।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলো, কিছু মনে করবেন না, ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা কেমন ?

অপূর্বর প্রশ্নে বিস্মিত হলেও স্বর্ণ জবাব দিল, শুনেছি ভালো না। তবে যে দুর্বার তাকে কে রুখবে বলুন।

স্বর্ণর কৈফিয়তে অপূর্ব হাসলো। এমন ভংগী করে হাসলো যাতে বোঝাতে চাইলো কথাটা নিছক ভাবতান্ত্রিক, গুরুত্ববোধক নয়। ভারিক্কির সংগে সে বল্ল, দেখুন আদর্শ মানুষের জীবনে উচ্ছ্বাস আনে। কিন্তু উচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখে পরিণামে তাকে জয়যুক্ত করাটাই বড়। যার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, সে কেন রাজনীতির আদর্শকে বেছে নেয় ? তার কারণ আদর্শের চেয়ে আদর্শের উচ্ছ্বাসই তাকে প্রলুব্ধ করে।

অপূর্বর কাছ থেকে এ ধরণের আলোচনা শুনবার প্রত্যাশা করে নি স্বর্ণ। বুঝতে পারলো লোকটাকে যতটা তুচ্ছ বলে ভেবেছিল ততটা নয় সে। কথা বলার সময় অপূর্ব বেশ ধীরে ধীরে কথা বলে। কথার মধ্যে প্রযুক্ত যুক্তিটার ওপর বেশ জোর দিয়ে সে তার বক্তব্যকে মর্মস্পর্শী করে তোলে। তার বিভ্রান্তিকর যুক্তিজালের মধ্য হতে মুক্তি পাবার জন্য স্বর্ণ বল্ল, উচ্ছ্বাসহীন আদর্শের কথা ভাবা যায় না। বোধ হয় উচ্ছ্বাস ছাড়া আদর্শ হয়ও না। আদর্শ যদি ভালো হয়, তবে উচ্ছ্বাসটা নিন্দার্হ কিসে ? জ্যোতিষ্মান সূর্য যদি মহান হয়

তবে যে রশ্মি তার সর্বাংগ থেকে বেরিয়ে আসে তা মোটেই তুচ্ছ নয়। রশ্মি না থাকলে সৌর জগতে সূর্য হয়ে থাকতো অপাংক্তেয়।

আবার হাসলো অপূর্ব। যেন বিরুদ্ধ যুক্তি অগ্রাহ্য করার অভিব্যক্তি হলো তার ওই হাসি। স্বুবর্ণ মনে মনে জ্বলে উঠলো। একটা চালের ব্যবসায়ী তার সংগে আদর্শের তর্ক করতে এসে জোর করে স্ব-যুক্তিকে বড় করতে চায়। তবু সে চুপ করে রইলো। লোকটার হাসির সম্মুখে এখন কিছু বলাটাই অশোভন।

অপূর্ব বল্লে, তুলনাটা অনেকটা এক রকম হলেও বহু দূরের। আপনি বুঝতে পারবেন না মিস চৌধুরী দরিদ্রের রাজনীতি করায় কত বিড়ম্বনা। কি আসবে ও থেকে ? আসবে শাস্তি, আসবে জেল, আসবে দারিদ্র্য দুঃখ অনাহার। অস্বাস্থ্য জীর্ণ করবে শরীর। বহু বর্ষ পরে মুক্তি পেয়ে বন্দী যখন ফিরে আসবে তার সামাজিক জীবনে, তখন তার সমস্ত মুক্তি অন্ধকারের ব্যর্থতায় মলিন হয়ে উঠবে।

স্বুবর্ণ বাধা দিতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে অপূর্ব বল্লে, সব কথা আমার শুনুন আগে। আমিও আপনার মত আশাবাদী, কিন্তু দরিদ্রের আশার আলো উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাই না। হাজার হাজার রাজবন্দী ফিসে আসে, কটা লোক তাদের চিনে আদর করে, তাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে ? এ কথা তো সত্যই যে পৃথিবীতে বৃহত্তম আদর্শ হলো বাঁচার আদর্শটাই। সেই বাঁচার পথ থেকে সে যখন পিছিয়ে পড়ার দলে পড়বে তখন তার আদর্শ জয়যুক্ত কই ? উচ্ছ্বাসই বা থাকবে কোথায় ?

স্বুবর্ণ বল্লে, বাঁচার অর্থ কি শুধু দুটো খেয়ে পরে বেঁচে থাকা ?

—কথাটা অনেকটা তাই, তবে দুটো নয়, অনেক অনেক, অনেক ভালোরকম। আমার জীবনের কাহিনী আজ নয় আরেকদিন যদি স্বুযোগ দেন তো শুনিয়ে যাবো। শুধু বলি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলাম আমি, বাঁচার প্রকৃত অর্থ আমার কাছে স্বুস্পষ্ট। এই বিশাল পৃথিবীর নগন্য কোণে দাঁড়িয়ে যখন বাঁচার কথা

ভাবতাম, তখন মনে হতো যারা প্রচার করে মানুষের মুক্তি-সুখ কৃচ্ছসাধনে ও নিঃস্বতার মধ্যে তারা সব মিথ্যাবাদী ভণ্ড, তারা মানুষের দারিদ্র্যে সান্ত্বনা যোগাতে চায় ধনকুবেরের নিরাপত্তার জন্য, ধর্মের উদ্দেশ্য সাধনে নয়। এ আমার বাস্তব উপলব্ধি মিস চৌধুরী, এর মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই, ভাবপ্রবণতা নেই। যখন পৃথিবীর অনেক মানুষ সুস্থভাবে খেয়ে দেয়ে প্রগতির পথে পা বাড়াচ্ছে, তখন আর এক দলকে কৃচ্ছসাধনের পরামর্শ দিয়ে গোটা মানুষের সমাজকেই প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে।

আবেগ দিয়ে কথা বলছে অপূর্ব। বাস্তব-বোধ আর যুক্তি তার চোখে-মুখে প্রকাশের প্রতিটী ভংগীমায় ফুটে উঠেছে। স্থবর্ণ তার বক্তব্যের আবেদনে অভিভূত হয়েছে। অপূর্ব বলতে লাগলো, শুধু এদেশেই শোনা যায় জেলে যাওয়ার মহৎ আদর্শের কথা। অথচ দেখি অন্য দেশে যারা দেশের মুক্তি সাধক, তারা একবার নয়, বহুবার জেল ভেঙে পালিয়েছে। ওদের কথা থাক। আমাদের দেশের রাজনীতিতে পূর্বাচার্যরা লক্ষ্য হিসেবে জেলকেই মোটামুটি নির্দেশ করেছেন। ওইখানেই তো আমার আপত্তি, বিশেষ করে দরিদ্রদের সম্পর্কে। বড়লোকরা জেলে যায়, তার কারণ জেলে গিয়েও তারা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে খুব মোটা মাসোহারা পায়, একবার শুধু উচ্ছ্বাসে ভরা গরম গরম বুলি দিয়ে কোনোরকমে জেলে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত! তখন প্রথম শ্রেণীর কয়েদি হয়ে দিব্য আরামে শুধু দিন কাটানো আর অত্যধিক চিন্তাশীলতার অজীর্ণতায় পাণ্ডুলিপি রচনা করা। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ফুলের মালা আর টাকার তোড়া। গরীবের কথা একবার ভাবুন তো। স্বাধীনতার বনিয়াদ তৈরী করে ওই গরীব আদর্শউচ্ছ্বাসীরা, যারা ত্যাগ দিয়ে কৃচ্ছসাধন দিয়ে জীবনের সর্ব-সার অঞ্জলি ভরে দান করে ইমারত গড়ে তোলে। তারা পায় না কিছুই, শাসনযন্ত্র সমাজ আর মানুষের সাধারণ স্মৃতি তাদের ফুরিয়ে দেয় নিঃশেষে। কেন তা হয়? সাধারণ সৈনিকের ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য এতই সামান্য?

শিক্ষা আমার বেশী নয় মিস চৌধুরী, হয় তো বক্তব্যের মূল কথাটা প্রখর ভাবে স্পষ্ট করতে পারলুম না, কিন্তু ধারণাটা আমার মোটামুটি এই।

অপূর্ব বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় সেই নিজস্ব ভংগীর দৃঢ়তা নিয়ে গেল। লোকটা হয় তো খুব দৃঢ়, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তার সমস্ত বক্তব্য-বিশ্বাসে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। স্থবর্ণকে কিছুটা আকৃষ্ট করেছে অপূর্ব, অপূর্বর stand-point of view সে অস্বীকার করতে পারলো না। লোকটা বলে গেল একদিন অতি দরিদ্র ছিল, আজ তা হলে নিশ্চয়ই নিজের কৃতিত্ব-বলে অর্থের মুখ দেখছে। অশিক্ষিত বলে তো মনে হয় না তাকে, নইলে অমন সংলাপ পেলো কি করে?

ইদানীং ক্ষিতীশবাবুর অনেকটা সময় অপূর্বর সংগে কথাবার্তায় ব্যয়িত হয়। অপূর্বর সংগে ক্ষিতীশবাবু বসে বসে স্পেকুলেশন করেন। যুদ্ধ এবার ক্লাইম্যাক্সে উঠছে, এখন একটা কিছু না করলেই নয়। শুধু সার্ভিসে কি হবে? অপূর্বকে তিনি পরামর্শদাতা বলে মনে করেন, অপূর্বর ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। তাঁর সে বিশ্বাসের পূর্ণ স্থযোগ নিচ্ছে অপূর্ব।

স্থবর্ণর সংগে আলাপ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে সে। স্থবিধা পেলে কারুর অনুমতির প্রত্যাশা না রেখেই স্থবর্ণর ষ্টাডিতে গিয়ে হাজির হয়। স্থবর্ণর সংগে সে জোর করেই আলাপ শুরু করে। স্থবর্ণ লোকটাকে ঠিকমত পছন্দ করে না, লোকটার কথায় অর্থের জৌলুষটাই উজ্জ্বল, সামান্য কারণেই সেটা প্রকাশ পায়। তা হলেও সব মিলিয়ে লোকটা তাকে আকৃষ্ট করেছে, তার সম্বন্ধে বিশেষ করে তার অতীত জীবন সম্বন্ধে স্থবর্ণ বেশ একটা কৌতূহল বোধ করে।

বর্ধমানের কাছাকাছি কোথায় একটা খাল কাটা হবে, তার কণ্ট্রাক্টটা অপূর্ব পেতে চায়। ক্ষিতীশবাবু স্ত্রীকে বলছিলেন, আমি যদি জেংকিন্স সাহেবকে একটু বলে দিই, তাহলে সহজেই ওটা অপূর্ব পেয়ে যায়। বলবো নাকি হ্যাঁগা?

স্বর্ণর মা জবাব দিলেন, বল্লে যদি হয় তো বলো না। ছেলেটী বড্ড ভালো গো।

ছেলেটী বড় ভালো! স্বর্ণ শুনেছিল একথা। মায়ের প্রশংসার অন্তর্নিহিত ইংগিতও সে বুঝতে পেরেছিল। এ বাড়ীতে অপূর্ব যেরকম গতিবিধি ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে তাতে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে সহ্য করা হচ্ছে এটাই স্পষ্ট।

একদিন সন্ধ্যার সময় অপূর্ব প্রকাণ্ড একটা ক্যাডিলাক গাড়ী নিয়ে এলো। ড্রইংরুমে বসেছিলেন ক্ষিতীশবাবু। অপূর্বকে আসতে দেখে তিনি বলে উঠলেন, এসো বাবা এসো। আজকের মার্কেটের খবর কি?

ভালোই, চায়ের শেয়ারগুলো খুব চড়া গেলো।

চালের দর আজ কি রকম?

বিয়াল্লিশ টাকা, শেষ পর্যন্ত ষাটে দাঁড়াবে। ভালো কথা, কিছু চমৎকার আতপ চাল পেয়েছি রাখবেন?

ক্ষিতীশবাবু বল্লেন, কত দর? এই বল্লে বিয়াল্লিশ টাকা, তার পরেই বলছো চমৎকার আতপ, ভয় হচ্ছে আমার সাথেও ব্যবসাদারী আরম্ভ করলে বুঝি।

অপূর্ব তাড়াতাড়ি লজ্জিত হয়ে বল্ল, আজ্ঞে না। আপনার সংগে ব্যবসা করবো একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তা ছাড়া ও চালটা আছে খুব সামান্য। ওটা আমাকে আপনি আমার কেনা-দামেই দেবেন।

—একটা সুসংবাদ তোমায় দিই অপূর্ব। জেংকিন্স সাহেব রাজী হয়েছে, তোমার টেণ্ডারটাই এ্যাকসেপ্ট করা হবে।

খবরটা শুনে অপূর্ব উল্লসিত হয়ে উঠলো। ঝাঁ করে ক্ষিতীশবাবুর পদধূলি নিয়ে বল্লে, আপনি আমার পিতৃতুল্য। ওটার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

ক্ষিতীশবাবু অপূর্বকে খুশি করতে পেরেছেন জেনে নিজেও উল্লসিত হলেন,

যদিও উল্লাসটা বাইরে প্রকাশ করলেন না। অপূর্বর উচ্ছ্বাসের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ও গাড়ীটা নোতুন কিনলে নাকি হে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চলুন না দেখবেন। অপূর্ব বল্ল বিনীত ভাবে।

সুবর্ণর মা ভিতর থেকে এই সময় এসে হাজির হলেন। অপূর্বর কথা শুনে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, অপূর্ব কি দেখবার কথা বলছে গো ?

ক্ষিতীশবাবু বল্লেন, অপূর্ব নোতুন গাড়ী কিনেছে একখানা। তাই দেখবার জন্য বলছিলো।

—বেশ তো, এক কাজ করো না অপূর্ব, সুবর্ণর মা বল্লেন, সোনার মাথা ধরে আছে বলছিলো। নোতুন গাড়ীতে ওকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো না একটু। ঘর থেকে মোটে বেরুতে চায় না মেয়েটা—খোলা হাওয়া বাতাস একটু গায়ে লাগানো দরকার।

নিশ্চয়ই, ক্ষিতীশবাবু প্রবল বেগে স্ত্রীকে সমর্থন করে বল্লেন, সোনা-মার মাথা ধরে থাকলে খোলা হাওয়ায় নিশ্চয়ই তা সেরে যাবে। খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছো তুমি, এর চেয়ে better পরামর্শ হয় না। তুমি আমার সত্যিকার বেটার-হাফ।

হাসতে লাগলেন ক্ষিতীশবাবু।

প্রতিমা দেবী অপূর্বর সামনে স্বামীর এই ধরণের রসিকতা শুনে লজ্জিত হয়ে উঠলেন। বিরক্ত হয়ে বল্লেন, কি যে তুমি বলো, কিছু তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই। অপূর্ব, তুমি তাহলে সুবর্ণকে ডেকেই নিয়ে এসো বাবা।

একরকম জোর করে তিনি তাকে সুবর্ণর ষ্টাডিতে পাঠিয়ে দিলেন। ষ্টাডিতেই ছিল সুবর্ণ। ঈষৎ ভেজানো ছিল দরজা। অপূর্ব তাতে দুটো টোকা দিয়ে বল্ল, ভিতরে আসতে পারি ?

সুবর্ণ বই পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত পড়ছিল বলা চলে না। কারণ কিছুক্ষণ পড়ার পরই সুধীনের চিন্তা এসে তার মনকে দোলা দিতে থাকে। সংগে সংগে

একটা বিষণ্ণ নৈঃশব্দ্য তাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। অনেকদিন হয়ে গেল সুধীনের কোনো খবরই সে পায় নি। আজো সে বাইরে আছে কি না কে জানে। একটা চিঠিও কি সে দিতে পারতো না? একটা ছোট্ট খবরও কি কোনো রকমে জানাতে পারতো না? সুবর্ণকে সে ভালোবাসে স্বীকার করে গেছে, তবু এভাবে অপাংক্তেয় করে রাখার এই অবজ্ঞা তার কেন? ভালোবাসার বিনিময়ে এই কি তার নিষ্ঠুর মূল্য আদায় করার রীতি?

দুঃখ-অভিমানে সুবর্ণ আহত হয়ে উঠেছিল, সেই সংগে একটা দুর্জয় আক্রোশ তার মনে জেগে উঠেছিল। বইটা খোলাই পড়েছিল, তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না তার। সুধীনকে জব্দ করতে হবে, তার অবজ্ঞার প্রতিদানে জানাতে হবে উপেক্ষা, তার ভালোবাসাকে আহত করতে হবে ঔদাসিন্যে, তার সমস্ত অহংকার ধূলায় লুটাতে হবে। সে যেন আবার ফিরে আসে সুবর্ণর কাছে। সুবর্ণর কাছে জানু পেতে সে যেন চায় ভিক্ষা, সুবর্ণকে সে যেন মিনতি করে বলে, আমি অন্যায় করেছি তোমার কাছে সু, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

অপূর্বর কথায় তার চমক ভেঙে গেল। সুধীনকে জব্দ করার যন্ত্র সে পেয়েছে। সাড়া দিয়ে বল্ল, আসুন।

ভিতরে এসেই অপূর্ব একেবারে তার কাছে গিয়ে বল্ল, শুনলাম আপনার ভয়ানক মাথা ধরেছে।

—তাই দেখতে এলেন?

—হ্যাঁ, মা বল্লেন কিনা। কিন্তু মাথা ধরে থাকলে বদ্ধ ঘরে থাকাটা অন্যায়ই মিস চৌধুরী। কারণ তাতে মাথা ধরাটা আরো বেড়ে যায়। তার চেয়ে চলুন খোলা ময়দানে হাওয়া খেয়ে আসবেন।

অপূর্বর কথা শুনে সুবর্ণ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেলো না। মাথা ধরা না সত্ত্বেও মাথা ধরার কাহিনী প্রচার তার কাছে ভারী কৌতুককর বলে মনে হলো। আর অপূর্বকে বাবা-মায়ের এইভাবে প্রশ্রয় দেওয়াটা তার কাছে ষড়যন্ত্র বলে মনে

হলো। তবু খুব বিরক্তিকর লাগলো না। অপূর্ব এখন তার কাছে অনেকট উঁচু স্তরে এসে গেছে, কারণ সুধীনের সংগে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সে সমমান না হলেও তার সমগ্র আয়তনে এমন একটা বলিষ্ঠতার আভাষ আছে যেটা সুবর্ণ কেন যে কোনো মেয়ের কাছেই প্রীতিকর। তাছাড়া অপূর্বকে সে হাতছাড়া করবে না, অপূর্ব তার আয়ুধ ঃ সুধীনের দর্পচূর্ণ করতে ও পিতামাতার পারিবারিক ষড়যন্ত্র ব্যথ করতে।

সুবর্ণ হাসলো। আহা, লোকটি বড় ভালো, বড় বাধ্য। তবু সে বল্ল, কি প্রয়োজন তার? ওটা আপনিই সেরে যাবে। সামান্য মাথা ধরা বৈত নয় ওর জন্য অত ব্যস্ত হবেন না অপূর্ব বাবু।

সুবর্ণর আপত্তিতে দমলো না অপূর্ব। দমবার পাত্র সে নয়। কোনে বিষয়েই দমে না বা নিরাশ হয় না। এই দুর্ভিক্ষের দিনে কেমন কায়দা করে সে চালের চোরা-কারবার চালাচ্ছে। ক্ষিতীশবাবুকে হাত করে তাঁকে দিয়েই সে কেমন সহজে জেংকিন্স সাহেবের দপ্তর থেকে দুলাখ টাকার একটা কণ্ট্রাক্ট বাগিয়ে নিলো। অদ্ভুত বুদ্ধি তার। সাপের মত প্যাঁচালো তার বুদ্ধির পাক।

সুবর্ণর মত মেয়েকে সে সহজেই হাত করতে পারে। হতে পারে মেয়েট ইণ্টেলেকচুয়েল, শিক্ষিতা। মনের গোপন স্তরে থাকতে পারে তার আদর্শ। হয়তে সে কামনা করে যে তার জীবনের সংগী হবে, পথ-প্রদর্শক হবে, সে যেন তাকে তার যোগ্য লক্ষ্যে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারে। আদর্শবান শিক্ষিত স্বামীর কামনা থাকা খুবই সম্ভব। ধনীর মেয়ে, অর্থটা তার সহজ লাগে। অর্থবান স্বামীর চেয়ে হয়তো আদর্শবান স্বামীই তার বেশী পছন্দ। তবু অপূর্বর বুদ্ধির কাছে সুবর্ণর ইণ্টেলেকচুয়ালিটি ভেসে যেতে কতক্ষণ! রূঢ় বাস্তবতার নিখাদ ছবিটা এদে দেখাও এদের চোখের সামনে, ইণ্টেলেকচুয়ালিটি চলে যাবে সংগে সংগে লড়াইয়ের যুগে বড় বড় লোহা-কারখানায়—বিরাট বিরাট জ্বলন্ত ফারনেশে আকাশ যেখানে দিবারাত্র লাল হয়ে রয়েছে, প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে রাত্রি-দিন যেখানে

অবিশ্রান্ত কাজ চলছে, লোহা গলাই হচ্ছে, ঢালাই হচ্ছে, মোল্ডিং ওয়েল্ডিং স্ক্রেপিং—দিবারাত্র সাঁ সাঁ ঝন্ ঝন্ শব্দ, নিয়ে যাও সেখানে ওই ভাবাতুর আদর্শবান যুবক-যুবতীদের, আগুনের সুতীব্র স্ফুলিংগে সমস্ত বুদ্ধিবাদ ওদের পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

সে কথা জানে অপূর্ব। তার তূনীরে অনেক অস্ত্র আছে। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। অপূর্বর আরেকটা অনুনয়ে স্বর্ণ সম্মতি দিল। অনেকদিন সে বাইরে বেড়াতে যায় নি। সুধীনের সংগে সেই একদিন চৌরংগীতে বায়োস্কোপ দেখে ফেরার সময় মাঠে বসেছিল, তারপর থেকে শিক্ষায়তন ছাড়া আর কোথাও যায় নি।

অপূর্ব নিজেই ড্রাইভ করে। স্বর্ণ পিছনে গিয়ে বসলো। ঝড়ের মত চৌরংগী রোড বেয়ে গাড়ী এসে থামলো ময়দানে। সমস্ত রাস্তা স্বর্ণ কথা বলে নি। নির্বাক হয়ে ছিল। অপূর্ব মাঝে মাঝে পিছনে ফিরে কথা কইবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি স্বর্ণ। মোটরের বাষ্পীয় গতির সাথে নৈঃশব্দ্য মিশিয়ে সে একটা অদ্ভুত অনুভূতি পেতে চাইছিল।

গাড়ী থেকে নেমে ওরা বসলো মাঠে। সেই একদিন আর আজ। গভীর অনুভূতিতে সেদিন দুজনে পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টা করেছিল। সুধীন সেদিন কত কথা বলেছিল তাকে, তীরস্কারও করেছিল। স্বর্ণর কেবলি সেকথা মনে পড়তে লাগলো। সেদিন রাত্রি নেমেছিল দুজনের মাথার ওপরের আকাশে। ব্ল্যাক-আউটের স্তব্ধতায় শবের মত পড়েছিল রাজপথ। আজ এখনো রাত্রি নামে নি। জনহীন হয় নি পথ। কত লোক রয়েছে মাঠে। কত প্রভেদ সে দিন আর আজ।

অপূর্ব তখন বকে চলেছে, ওই দেখুন রেড রোডের ও পাশের ওই ঘেরা জমিটা আমার কণ্ট্রাক্ট। ট্রুপ্‌সদের ঘর তুলতে হবে। স্যানিটেশন তৈরী করতে হবে। ইলেকট্রিক নিয়ে যেতে হবে। সমস্ত মাঠটা কদিনে আমি ভরিয়ে ফেলি

দেখুন। ওই দিকটায় এয়ার-ব্যারাক তৈরী হচ্ছে। এই কণ্ট্রাক্টটা থেকে কমসে কম হাজার ত্রিশেক টাকা আমার আসবে।

গর্বের কথাগুলো!…টাকা আমার কাম্য, পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের মধ্যে টাকাকেই আমি শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছি। বড় হতে হলে টাকা চাই, সুখ পেতে হলে টাকা চাই, ঐশ্বর্য বিলাস আরাম উপভোগ করতে হলে প্রয়োজন টাকার। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা—টাকা ছাড়া কিছুরই মূল্য নেই।

আত্মগতভাবে বকে চলেছে লোকটা। হয় তো সুবর্ণকে কাছে পেয়ে সে তার মনের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, আপনার অতীত জীবনের কাহিনী শোনাবেন বলেছিলেন। আজই বলুন না।

অপূর্ব বল্লে, শুনতে চান? বেশ শুনুন। নিঃস্ব ছিলাম। আমাকে জন্ম দিয়েই মা পৃথিবী থেকে চলে গেছলেন, বাবাও তার কিছু দিনের মধ্যে গেলেন। উত্তরাধিকারসুত্রে শুধু প্রাণটাই ছিল পৈত্রিক সম্পত্তি। অসহায় একা ঘুরে বেড়াতাম পথে পথে। শুকনো মুখ দেখা সত্ত্বেও আত্মীয়রা কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করতো না খাওয়া হয়েছে কি না বা কদিন ধরে অনাহার চল্‌ছে। বড় হলাম এই অবস্থায়। ভিক্ষে করে লোকের করুণা কুড়িয়ে লেখাপড়া শিখলাম, বেশী দূর এগোল না। এগোবার ইচ্ছাও ছিল না। শিক্ষায় প্রবৃত্তি ছিল না, যে শিক্ষালাভ করতে প্রথম প্রয়োজন হয় অর্থের সেই অর্থেরই আরাধনা করতে আরম্ভ করলুম। অর্থের লালসা দিন দিন বাড়তে লাগলো।

কথা থামিয়ে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলো, মিস চৌধুরী, ওই হোটেলটায় যাবেন?

সুবর্ণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হোটেলে কেন?

—আত্মচরিত্ বর্ণনা করতে একটা সিলিনেস আসছে, কিছু খেয়ে নিতাম।

সুবর্ণ অপূর্বর মুখের পানে চেয়ে বল্ল, আপনি ড্রিংক করেন?

—করি না যে তা নয়, অপূর্ব মিথ্যার আশ্রয় নিলো না, তবে অভ্যাস ওসব কিছু নেই। আচ্ছা থাক, আপনি শুনুন। ঢুকলাম এক চাকরীতে, সামান্য এক

চাকরী, পঁয়ত্রিশ টাকার কেরাণী। একদিন পথে কুড়িয়ে পেলাম একটা লম্বা খাম। খুলে দেখি তাতে দশখানা একশো টাকার নোট। আনকোরা নোতুন নোট। গায়ে মালিকের নাম-ধাম লেখা।

স্বর্ণর কৌতূহল বোধ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলো, কি করলেন আপনি?

অপূর্ব বল্লে, লোভ হলো ভীষণ। সামান্য পঁয়ত্রিশ টাকা পাই, হাজার টাকা কুড়িয়ে পেলে লোভ না হওয়াটাই অন্যায়। কিন্তু টাকা পয়সার ওপর আমার ভীষণ লোভ থাকলেও মনোবৃত্তির দিক থেকে আমি গর্ব করতে পারি। বরাবরই ওটা আমার খুব উচু। ভাবলাম টাকা আমি যে কোনো উপায়ে রোজগার করবো, ঢের বেশী টাকা, চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার, লাখ, দুলাখ যে কোনো উপায়ে, কিন্তু এভাবে কুড়িয়ে পাওয়া দান আমি চাই না। কেন এই সামান্য বেটপকা হাজার টাকা আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ইতিহাসের কিছুটা অংশ কলংকিত করে রাখবে। চাই না, শির উচু করে ফেরৎ দিতে গেলাম ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক অবাক, এমনটী আশা করেন নি তিনি। আমার নাম ঠিকানা বৃত্তি সব জেনে নিয়ে ওই হাজার টাকা আমায় দিয়ে বল্লেন, ব্যবসা করো, পরে শোধ দিও। নিলাম না, ফেরৎ দিলাম, তাঁকে খুব বেশী রকম অবাক করেই ফেরৎ দিলাম। ধারও নেবো না।

স্বর্ণ একটু মুগ্ধ হলো। অর্থলোভী বটে লোকটা, কিন্তু আশ্চর্য মনোবল এর, কি বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি। সে বল্ল, বাঃ!

প্রশংসাটা তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, যতই মুগ্ধ হোক সে, প্রশংসা করতে চায় নি। কিন্তু সেটা তার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এলো। অপূর্ব উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগলো, কিছু দিন চল্লো এই রকম। নিদারুণ দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যে। কোলকাতার সব চেয়ে জঘন্য একটা মেসে সস্তার খাওয়া-শোওয়া যোগাড় করে দিন কাটাতে লাগলুম। বছর তিনেক পরে দেখা গেলো সামান্য কিছু টাকা জমাতে পেরেছি। ব্যস, স্পেকুলেশন আরম্ভ হলো। দু-চার জন

ব্যবসায়ী লোকের কাছে ঘুরতে লাগলুম, তারপর সুবিধে বুঝে কিনে ফেল্লুম কিছু শেয়ার। কিছু দিন পরে আরো কিছু। লড়াইয়ের আশংকা দিন দিন বাড়ছে। শেয়ারের দরও হু হু করে উঠছে। শেয়ার মার্কেটে যাতায়াত করতে আরম্ভ করলুম। দ্বিগুণ তিনগুণ দর পেলাম ছাড়লাম না, তারপর যখন ছাড়লাম, তখন হাতে এলো চারগুণ টাকা। ইতিমধ্যে আরো কিছু কামিয়ে ফেলেছি দালালী করে। ব্যস আমায় পায় কে? ব্যবসায়ী মহলে আমার ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়লো. ব্যবসায়ীরা আমার সংগে গোপন পরামর্শ করতে লাগলো। লড়াই বাধলো। সংগে সংগে হু হু করে টাকা আসতে লাগলো, সুযোগ বুঝে হাজার মণ চাল ষ্টক করে ফেল্লুম।

—তারপর?

অপূর্ব একটু থেমে স্বর্ণর মুখের পানে চেয়ে বল্ল, তার পরের ইতিহাস আপনি জানেন মিস চৌধুরী। সেটা বর্তমান অধ্যায়।

স্বর্ণ সমস্ত শুনে চুপ করে রইলো। একটু শ্রদ্ধাও এলো মনে। এ-ও এক ধরণের মানুষ। এর মধ্যেও রয়েছে বলিষ্ঠতা, স্বকীয় আদর্শের তপস্যা। এ লোকটীও কারুর কাছে শির নোয়ায় নি। শিক্ষার সম্পদ এর কতখানি আছে স্বর্ণ জানে না, অবশ্য তার বিশ্বাস তা খুব সামান্য নয়। কিন্তু সে জানে এর আছে সংগ্রামের ইতিহাস, যুদ্ধ জয়ের গৌরবদীপ্ত কাহিনী—নিঃস্ব হয়েও সর্বহারার জীবনযুদ্ধে সে বীর সেনাপতির মত দারিদ্র্যকে পরাভূত করেছে। দুঃখ-দারিদ্র্যভরা মানুষের সমাজে ওটা কি মস্ত বড় কৃতিত্বের বস্তু নয়? স্বর্ণর মনে হলো একে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা চলে না, উপেক্ষায় এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

যে গোপন বিরূপতা তার সম্পর্কে গোড়ায় ছিল সেটা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। হুস্ হুস্ করে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ লাগছিল। গাছগুলো ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ছিল। মাথার ওপর দিয়ে বহুক্ষণ আগে থেকেই

বাদুড়েরা উড়ে উড়ে বাসায় ফিরতে শুরু করেছিল। অন্ধকার ক্রমশ বেশ শক্ত হয়ে নামতে থাকলেও এখনো তাদের ছুটোছুটি শেষ হয় নি। খানিক পরে স্থবর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, অর্থ আপনি উপার্জন করছেন অনেক, কিন্তু অর্থকে সেফ্-বন্দী করে রাখাই আপনার কাম্য ?

ও-হো হো, অদ্ভুতভাবে হেসে বল্ল অপূর্ব, অর্থোপার্জনের আশার কথা ব্যক্ত করেছি, ব্যয় করবার কথাটা জানাই নি। কিন্তু ব্যয় করার বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য ধনীদের সংগে আমি সম্পূর্ণ একমত। সাম্যবাদের যুগেও ওই পুরোনো মতবাদটা আমি ছাড়তে পারি না।

স্থবর্ণ বল্লে, পারেন না তা জানি। এই দুর্ভিক্ষের দিনে চালের কারবার যখন স্টার্ট করছেন, তখন বুঝতে হবে আপনার সিন্দুকটা বড় স্বার্থপর। তাতে দিব্যি অর্থ ঢেলে রাখা যায়, কিন্তু বার করে নিয়ে আসা যায় না। কিন্তু, স্থবর্ণ এবার আন্তরিক হবার চেষ্টা করলো, আপনি তো দারিদ্র্যকে জানেন, দেশের দারিদ্র্য দূর করবার কাজে আপনিও কি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবেন ?

প্রয়োজন মত নয়, অপূর্ব জবাব দিল, কিন্তু অর্থ জিনিষটা লোভের বস্তু হয়েই থাক এই আমার কামনা। সস্তায় সহজ লভ্য হোক এ আমি কিছুতেই চাইবো না। তবে অর্থের প্রসার হোক সমস্ত দেশময় শিল্পে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে এ আমি নিশ্চয়ই কামনা করি। মুঠো মুঠো টাকা পারিশ্রমিক দিতে কুণ্ঠাবোধ করবো না, তবে পরিশ্রমটা থাকা চাই যথেষ্ট। এই আমার অভিমত।

স্থবর্ণ তর্ক করতে চাইলো। বল্লে, পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক যত বেশীই দেওয়া হোক না কেন, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির রোধ তাতে হবে না। এতে একদিকে অর্থের প্রসার হবে, অন্যদিকে তা অনেক বেশী সংকুচিত, সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। আমার কথা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন অপূর্ব বাবু ?

বুঝতে পারছি, অপূর্ব গম্ভীর মুখে জবাব দিল, অবশ্য অর্থনীতি আমি পড়ি নি। কারণ শিক্ষা আমার বেশী নয়। আমার চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষা আপনি পেয়েছেন মিস চৌধুরী। ঢের বেশী অধ্যয়ন করেছেন। তবু আমি বলবো বাস্তব অভিজ্ঞতা আপনার চাইতে আমার অনেক বেশী। আপনাদের পুঁথির পাতার অসংখ্য থিওরি আমি পড়ি নি, কিন্তু অনেক বেশী সংখ্যক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। নিদারুণ দারিদ্র্য অভাব অনটনের মধ্যে জন্মেছি বলে ঘৃণ্য আবর্জনার মধ্যেও আমি দিন কাটিয়েছি। সমাজের সকল স্তরে ঘুরে বেড়ানোর দরুণ বিভিন্ন মানুষের মনোজগত পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি দেখেছি স্বর্গ-নরকের পার্থক্য। আমি বুঝবার চেষ্টা করেছি মানুষকে। আমি পাখীর মত কত নগরে বন্দরে রেল-ষ্টেশনে সমুদ্রে পাহাড়ে নদীতে ড্রইংরুম-কোর্ট-অফিসে, চায়ের বৈঠক মদের আড্ডা সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি আর পাখা গুটিয়ে নেমেছি। আবার অন্যত্র উড়ে চলেছি পাখা মেলে। আমি দেখেছি মানুষের ব্যর্থতার ইতিহাস, আমি দেখেছি তাদের উত্থান-পতনের গতি। স্বচ্ছ পরিষ্কার দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমি সমস্তটা দেখেছি। আমার দিগ্‌দর্শনযন্ত্র নির্ভুল সুবর্ণ দেবী।

সেই অদ্ভুত ভাষার কুহক। অপরূপ বর্ণনার ইন্দ্রজাল। সত্য কিনা কে জানে অন্তত সুবর্ণ অবাক হয়ে গেল। আত্মবিশ্বাসের সংগে গর্ব মিশিয়ে লোকটা কথা বলছে, সুবর্ণর সমস্ত যুক্তি তলিয়ে গেল। এই অর্থবিলাসী পুরুষে বলীয়ান আত্মপ্রতিষ্ঠা সুবর্ণর যুক্তির ভিত্তিতে সুদৃঢ় আঘাত করলো। সে আর কিছু বলতে পারলো না।

অপূর্ব কৌশলী। নিশ্চয় সে কৌশলী। তাছাড়া সুবর্ণর মত বই-পড়া আদর্শভারাবনতা মেয়ের কাছে তার পরাজয় হবে এটা নিশ্চয় বিধাতারও অভিপ্রায় নয়। অনেক অস্ত্র তার হাতে আছে। কিন্তু সেগুলো আপাতত থাক, সুবর্ণ শিক্ষিতা হোক, বুদ্ধিমতী হোক, আদর্শবাদী হোক, সে একটা মেয়ে একটা

ভীরু মেয়ে, একটু দুর্জয় কৌশল ও আদর্শের রকম-ফের করার পদ্ধতি জানা থাকলেই যথেষ্ট।

অবচেতন মনটা মানুষের বড় অসতর্ক। আর বোধ হয় একটু স্বার্থপরও। অপূর্ব যখন তখন এ বাড়ীতে এসে সোজা চলে যায় স্নবর্ণর ষ্টাডিতে। দুজনের নির্বিবাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ চলে। মাঝে মাঝে ওদের দ্বৈত হাসির কলরোলে ষ্টাডির বাইরের আবহাওয়া আলোড়িত হয়ে ওঠে। সেটা চৌধুরী-দম্পতিকে আশ্বস্তই করে। অপূর্বর ব্যাংক-ব্যালান্সের প্রাত্যহিক স্ফীতি তাঁদের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

একদিন দুপুর বেলায় অপূর্ব এসে হাজির। স্নবর্ণ সেদিন কলেজ যাবে না জানা ছিল ওর। জিজ্ঞাসা করলো, কি করছেন মিস চৌধুরী? কাগজ পড়ছেন?

স্নবর্ণ সংবাদপত্র পড়ছিল। বল্লে, হ্যাঁ। দেখেছেন এ খবরটা, বলে কাগজের এক অংশের প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্ল, আপনার পক্ষে ওটা ইণ্টারেষ্টিং, নয়?

খবরটা পড়ে নিয়ে অপূর্ব বল্ল, চীনের দুর্ভিক্ষ! ও বিষয়ে আমার কি করণীয়?

বাঃ! স্নবর্ণ বিস্ময় প্রকাশ করে বল্ল, ব্যবসায়ী মানুষ, স্পেকুলেশন করেন, অথচ এই গূঢ় ইংগিতটা ধরতে পারলেন না?

অপূর্ব অতি বিনয় প্রকাশ করে বল্লে, আপনি ধরিয়ে দিলে তবে ধরতে পারবো মিস চৌধুরী।

—চীনের দুর্ভিক্ষে আপনি সহজেই কিছু মুনাফা করতে পারেন অপূর্ববাবু। শুনেছি আরসোলা ওদের প্রিয় খাদ্য। এখান থেকে দশ বিশ টন আরসোলা চালান দিতে পারলে কিছু লাভ করা যায় না কি? মূলধনের সমস্যাও নেই বিশেষ।

—ও হো হো, এই ইংগিত! প্রাণ খুলে হেসে নিল অপূর্ব। আমি আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি, পরিকল্পনাটা খুব সুন্দর। কিন্তু আরসোলা সংগ্রহের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র এনার্জি নষ্ট করার ইচ্ছা আমার নেই। কারণ মূলধন বিশেষ না লাগলেও পরিশ্রমের মূল্যটা অতি দুর্মূল্যই। বলে আরেকচোট হেসে নিল সে। সুবর্ণও সে হাসিতে যোগ দিল।

গড়ের মাঠের কণ্ট্রাক্ট পূর্ণ হওয়া মাত্রই অপূর্ব আরো একটা বড় কণ্ট্রাক্ট পেলো। আসানসোলে এরোড্রাম তৈরী করতে হবে। সেখানে প্রকাণ্ড একটা বিল্ডিং ভাড়া নিল অপূর্ব। নোতুন ষ্টাফ রিক্রুট করে বিরাট অফিস বসালো। মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট ছাড়া আরেকটা কাজে হাত দিয়েছে সে। দামোদরের বেসিনে (অববাহিকায়) ব্রিক ফিল্ড পত্তন করেছে। ইটখোলায় ইট তৈরী করে কাছাকাছি সেই ইট চালান দেবে অপূর্ব।

ষ্টাফের খাওয়া-দাওয়া থাকা সেখানেই। দুজন নেপালী আর একটা উড়ে পাচক রাখা হলো। আসানসোলের চক থেকে নিত্য পাঁঠা-মুরগী আসার ব্যবস্থা হলো।

একদিন সুবর্ণর কাছে প্রস্তাব করলো, চলুন একদিন আসানসোল যাই। নোতুন গাড়ীটায় লম্বা পাড়ি দেয়া যাবে সোজা গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে। মধ্যে বর্ধমানে নেমে কিছু খেয়ে নেয়া যাবে। এখানে কাউকে কিচ্ছুটি বলা হবে না। তারপর সেখানে পৌছেই এক টেলিগ্রাম। কেমন একটা এ্যাডভেঞ্চার হবে বলুন তো মিস চৌধুরী।

মন্দ নয়, স্বর্ণ ভাবলো একটু, তারপর সোৎসাহে লাফিয়ে উঠলো, খুব ভালো প্রস্তাব। চলুন এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক। নাই-বা কেউ জানলো বাড়ীতে।

চুপি চুপি দুজনে বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে। অপূর্বর বাইশ হাজার টাকায় নোতুন কেনা ক্যাডিলাক ঝড়ের মত উড়ে চল্ল গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে। অপূর্ব সুন্দর ড্রাইভ করে। স্বর্ণ আজ আর পিছনে নয় পাশেই বসে আছে। বর্ধমানে এসে গাড়ী থামলো। স্বর্ণ কিছু খেতে চাইলো না। আসানসোলে যখন এসে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

কর্মচারীরা সোরগোল করে ছুটে এলো। অপূর্বর সংগে স্বর্ণকে দেখে একটু বিস্মিতও হলো। স্বর্ণর লজ্জাবোধ হচ্ছিল এতগুলি লোকের সামনে। অপূর্বর সংগে তার সম্পর্কের কি পরিচয় হতে পারে এদের কাছে তা ভেবে সে লজ্জিত হয়ে উঠছিল। অপূর্ব তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে একটা ঘরে তাকে বসিয়ে গুমন্ বাহাদুরকে ডাকলো।

স্বর্ণকে বল্ল, সন্ধ্যে হয়ে গেল মিস চৌধুরী, আজ আর ফেরা চলবে না।

সে কি! এতক্ষণ ক্যাডিলাকের প্রচণ্ড গতিতে অভিভূত স্বর্ণর ফেরার কথা মনেই ছিল না। অপূর্বর কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে সে বল্ল, তা কি করে হয়?

অপূর্ব বল্ল, এই পাঁচ ঘণ্টা গাড়ী চালিয়ে এসে টায়ার্ড ফিল করছি। বাড়ী ফিরতে হলে এখনি উঠতে হয়, তাও রাত বারোটার আগে পৌঁছানো যাবে না। আজকের রাতটা কাটিয়ে নিন, কাল এখানকার সমস্ত দেখে শুনে বেড়িয়ে ফেরা যাবে। আজ আর হয় না।

শেষের কথাটা কিছুটা দৃঢ়তার সংগে বল্ল অপূর্ব। তার কথার দৃঢ়তা স্বর্ণর মনে যেন একটা শক্ দিল। তার মনে হলো লোকটা যেন অসীম শক্তিধর ঐন্দ্রজালিক, তাকে যাদু করে ফেলেছে। তার নির্দেশের বাইরে যাবার সাধ্য স্বর্ণর নেই। এতক্ষণে তার মনে হলো এইভাবে কাউকে না জানিয়ে অপূর্বর সংগে হঠাৎ চলে আসাটা উচিত হয় নি। চতুষ্পার্শে অজানা অজ্ঞাত পরিচয়

মানুষের কৌতূহলী মিছিল। স্থবর্ণকে দেখে তাদের মনে না জানি কত বিস্ময় কত কৌতূহল জমা হয়েছে। অন্ধকার বেড়ে ওঠার সংগে সংগে তার মনে একটা ভয় প্রকাণ্ড কালো বাতুড়ের মত বাসা বাধছিল।

অপূর্ব বল্লে, ভাববেন না মিস চৌধুরী। কাল ফিরবো জানিয়ে গুমন্ বাহাত্বরকে দিয়ে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি। ঘণ্টা তুয়ের মধ্যেই পেয়ে যাবেন চৌধুরী মশাই।

টেলিগ্রাম পাঠাবার কথা শুনেও স্থবর্ণ বিশেষ আশ্বস্ত হতে পারলো না। বাড়ীতে এখন তাঁরা কত কি ভাবছেন। সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও রাত্রি বাড়ার সংগে সংগে তাঁদের উৎকণ্ঠাও বাড়তে থাকবে। এখানে রাত কাটিয়ে বাড়ীতে ফিরলে তাঁরা কি ভাববেন? অপূর্ব কে, কি তার পরিচয়, সেই তো তাকে প্রলুব্ধ করে এনেছে। কেন সে এলো?

লম্বা করিডরের কোণের ঘরটা স্থবর্ণর জন্য নির্দিষ্ট হলো। করিডর বরাবর পরস্পর সংলগ্ন ঘরগুলি। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া যায় মাঝের দরজা দিয়ে। গুমন্ বাহাত্বর খাবার নিয়ে এলে স্থবর্ণ সামান্য কিছু খেয়ে ভেতর থেকে ভালো করে দরজা এঁটে দিল। গভীর রাত্রে হঠাৎ পাশের ঘরে বুকচাপা কাশির আওয়াজ পেয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো আলো জ্বলছে ওঘরে।

কাশছে লোকটা। ঠুং করে একটা শব্দ হলো। কাচের পাত্রে কোনো কিছুর আঘাতের শব্দ। একটা সোডার বোতলের কর্ক খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। গেলাসে তরল পদার্থ ঢালবার টলটলে শব্দটাও পরিষ্কার শোনা গেল। স্থবর্ণর বুঝতে বাকি রইলো না লোকটা মদ খাচ্ছে।

বুঝতে পেরে সে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। মাতাল হয়ে লোকটা যদি দরজা ভেঙে এ ঘরে আসবার চেষ্টা করে। গভীর রাত্রে নির্বান্ধব পুরীতে একা একটা ঘরে বন্দিনী নারী, সে কথা কি মাতাল লোকটা জানে না?

এমন পরিস্থিতি তার জীবনে এই প্রথম। হঠাৎ লোকটা কেঁদে উঠলো, বিকৃত স্বরে বলতে লাগলো, সোনিয়া, ডার্লিং, আই লাভ ইউ, আই অ্যাডোর ইউ!

দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়ালো স্বর্ণ। দেখলো একটী প্রৌঢ়, চুলগুলো প্রায় সব পেকে এসেছে, মদের গেলাস হাতে নিয়ে কাঁদছে। দুচোখ থেকে তার জল গড়িয়ে আসছে।

স্বর্ণর মন থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়ে এলো একটা করুণা। কি গভীর বেদনাবোধ আজ নিঃসংগ নিশীথের বিনিদ্র প্রহরে লোকটিকে পীড়িত করছে ভেবে মনটা তার আর্দ্র হয়ে এলো। প্রেম কি নিষ্ঠুর!

বিছানায় চলে এলো স্বর্ণ।

সকাল বেলায় স্বর্ণ বাইরে আসতেই অপূর্বর সংগে দেখা। করিডরে পায়চারি করছিল অপূর্ব। স্বর্ণর জন্য সে অপেক্ষা করছিল। সে আসতেই অপূর্ব এগিয়ে এলো তার দিকে: সুপ্রভাত মিস স্বর্ণ। ঘুম হয়েছিল?

করিডরের সামনেই খোলা আকাশ। লনে কতকগুলি ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ। শ্বেত মসৃণ নিভাঁজ তাদের গা। শির্ শির্ করে হাওয়া বইছে, ইউক্যালিপ্‌টাসের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে। নোতুন রোদ্দুর উঠেছে, মৃদু নরম তার উত্তাপ। সম্মুখের নির্জন পথ দিয়ে একটী সাঁওতাল মেয়ে চলে গেল দূরের উদ্দেশ্যে। খোঁপায় তার গতরাত্রির বাসি ফুল। অপূর্ব স্বর্ণর জবাবের জন্য আন্তরিক হাসিভরা মুখ নিয়ে তার পানে চাইলো।

নোতুন জায়গার প্রভাতী পরিবেশ স্বর্ণর মন থেকে সমস্ত অবসাদ-জড়িমা দূর করে দিল। রাত্রের অমূলক আশংকার কথা ভেবে তার হাসি পেলো। সে বল্ল, হয়েছিল, কিন্তু ও পাশের ঘরে কে থাকে বলুন তো?

—ওটায় থাকেন এখানকার কলেজের এক প্রফেসর। ভদ্রলোক অনেক বছর আগে জার্মাণীতে কেমিষ্ট্রির ছাত্র হয়ে গিয়ে শেষটায় সেখানেই অধ্যাপনা করতেন।

যুদ্ধের গোড়াতেই পালিয়ে আসেন দেশে। এখানকার কলেজে এখন প্রফেসারী করছেন। কেন বলুন তো?

স্থবর্ণ কিছু বলে না। হাওয়া এসে অনবরত তার চুলে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। বার বার চঞ্চল চুল মুখের উপর উড়ে পড়ছে। বার বার তা সরাতে গিয়ে স্থবর্ণ শেষে বিরক্ত হয়ে উঠছে। সকালের স্বচ্ছ আলো ঠিকরে পড়েছে তার মুখে। অপূর্ব স্থবর্ণর প্রচেষ্টা দেখে হেসে বল্ল, আপনাকে দেখে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেলো, অবাধ্য অলক আজ আপনাকে যেমন বিরক্ত করছে, ঠিক এমনি করে আজ থেকে অনেক বছর আগে তুটো ভ্রমর বিরক্ত করেছিল শকুন্তলাকে।

অপূর্বর কথায় স্থবর্ণ আরক্ত হয়ে উঠলো। কৃত্রিম বিরক্তি নিয়ে এমন ভাবে চাইলো তার দিকে যে অপূর্ব তাতে শংকান্বিত হওয়া দূরে থাক ধন্য হয়ে গেল।

সারাদিন ওরা বেড়ালো। অপূর্ব মোটরে ওকে চারিদিক দেখিয়ে বেড়ালো। জংগল সাফ করে এরোড্রাম তৈরী হচ্ছে। সিমেণ্ট ঢালাই করছে মেয়ে-মজুরের দল। কিছু দূরে এক ছোট্ট কোলিয়ারী। ভূগর্ভ থেকে একটী চারপাশ খোলা লিফট্ তিন মিনিট অন্তর অন্তর উঠে আসছে, নগ্ন-গাত্র বলিষ্ঠ সাঁওতাল সগুকাটা কয়লার ঝুড়ি নামিয়ে দিয়েই ফের লিফ্টে নীচে নামছে। স্থবর্ণ নীচে গিয়ে খনি দেখতে চাইলো, জমাদার জানালো: খাদ অনেকটা নীচু, বড্ড গরম। তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, লিফ্টে নামার সময় জামাকাপড় সব নষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল বলে নীচে নামা হলো না।

দামোদরের অববাহিকায় অপূর্বর নোতুন ব্রিক ফিল্ড স্থাপিত হয়েছে। স্থবর্ণকে নিয়ে সে পরিদর্শন করতে গেল। স্থবর্ণর গাড়ী থেকে নামা হলো না। বৃষ্টির দরুণ সমস্ত জায়গাটা কাদা হয়ে রয়েছে। স্থবর্ণকে নামতে দিল না অপূর্ব।

অল্প দূরে বার্ণপুর। মার্টিন কোম্পানীর বিরাট কারখানা। পাশেই ন্যাশনাল স্টিল কোং ও S C O B এর ফ্যাক্টরী। পাশ ছাড়া ঢোকার উপায় নাই। কিন্তু অপূর্বর মোটর সোজা ভেতরে চলে গেল, কেউ কৈফিয়ৎ দাবী করলো না।

—দেখছেন, কীরকম ওয়র-প্রোডাকসন হচ্ছে। ডে এ্যাণ্ড নাইট—সিফ্‌টের পর সিফ্‌ট।···গলিত লৌহ প্রকাণ্ড কড়াইয়ে এসে পড়ছে। তারপর যাচ্ছে ছাঁচে। বেরিয়ে আসছে ফ্ল্যাটসিট, বিম, কতকি! অভিভূত হয়ে গেল স্ুবর্ণ। অপূর্ব নিজের সান-গ্লাশটা স্ুবর্ণকে দিল পরতে। অগ্নি-ঝলক চোখে আঘাত করতে পারে। বেশীক্ষণ সেখানে থাকতে পারলো না স্ুবর্ণ, কারখানার ভিতরটা ফার্ণেসের উত্তাপে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর অপূর্ব বল্ল স্ুবর্ণকে, চলুন এখানকার আর একটী দর্শনীয় আপনাকে দেখিয়ে আনি।

স্ুবর্ণ দর্শনীয়টা কি তা জানতে চাইলে অপূর্ব বল্লে, আগে থেকে কিচ্ছু জানানো হবে না আপনাকে।

ছোট্ট একটী একতলা বাড়ীর সম্মুখে এসে থামলো অপূর্বর মোটর। গাড়ী থেকে নামলো ওরা। ফটকের নাম ফলকে লেখা ঃ তপোবন-নিলয়। ভেতরে চলে এলো দুজনে। সুন্দর সুদৃশ্য একটী ঘর। দেয়ালে অসংখ্য বড় বড় ছবির ফ্রেম—তেত্রিশ কোটি দেবতারা প্রায় সবাই-ই এসে ভিড় করেছেন। মেঝেটা পুরু মির্জাপুরী কার্পেটে মোড়া। একদিকের দেয়ালের কোণে একটি জল-চৌকি। তার ওপর বিছানো মস্ত বড় বাঘছাল, তা চৌকি ছেড়ে মেঝের কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়েছে। এক সাধু মহারাজের ফটো তার ওপর—মাল্যবিলম্বিত।

বিপরীত দিকের দেয়ালের মধ্যস্থলে তাকিয়া ঠেস দিয়ে সমাসীন এক প্রায়-বৃদ্ধ মহাত্মা। স্বামী আত্মানন্দজী মহারাজ। পরণে গেরুয়া। নগ্ন গাত্র। দুপাশে দুজন মহিলা তাঁকে ব্যজন করছে। যা দেখে আশ্চর্য হলো স্ুবর্ণ তা হলো প্রকাণ্ড এক কৃষ্ণকায় গাভী ঘরের মধ্যে উঠে এসে তার বিপুল অবয়ব নিয়ে একেবারে শুয়ে পড়েছে কার্পেটের ওপর। আর আত্মানন্দজী মহারাজ দুহাত বাড়িয়ে গাভীর পদ সেবা করছেন। গো-মাতা আরামে আনন্দে একেবারে চোখ মুদে ঘণ্টা দুই

পূর্বের ভূক্ত খাদ্যের চর্বিত চর্বণ করে চলেছে। সম্ভবত তার তুরীয় অবস্থা আর আত্মানন্দ স্বামীর মুখে প্রেমের স্বর্গীয় দ্যুতি। তার ঠিক পায়ের গোড়াতে বসে আছে এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী গেরুয়াধারিনী নারী—বয়স বোধ হয় তার ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। মেয়েটি আত্মানন্দের সেবিকা।

ওদের দুজনকে আসতে দেখে মেয়েটী অভ্যর্থনা করে বল্লে, আসুন।

দুজনে বসলে সে জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের নিবাস কোথায় ?

সুবর্ণ জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু অপূর্ব তার জবাব দেবার পূর্বেই বল্লে, নিবাস আমাদের এই কাছেই। এখান থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ।

—আসবেন এখানে মাঝে মাঝে, এত কাছে থেকেও যদি দূরে থাকেন, তবে মানুষের মিলনের ভাব সম্পূর্ণ হয় না জীবনে। আমরা সবাই যে এক।

অপূর্ব বল্লে, কাছে বলেই তো নজর পড়ে না। আমাদের সকলের দৃষ্টিই দূরের দিকে কিনা।

তা ঠিক, মেয়েটী উৎসাহিত হয়ে বল্লে, তবে কি জানেন, দূরের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত বলে কাছের নাগাল আমরা পাই না। অথচ কত রত্নই যে কাছের মাটিতে লুকিয়ে থাকে কেউ তার হদিশ পায় না।

মেয়েটীর কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন মহাত্মা বাবাজী। বল্লেন, শুনুন কি সুন্দর কথা ওঁর। আহা, মা মাগো!

গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো অপূর্ব, সংসারী মানুষ, বদ্ধজীব, এ সব বিষয়ে দৃষ্টি দেবার সময়ই পাই না। তবে আপনি আসতে বলছেন আসবো, বিলক্ষণ আসবো।

আত্মানন্দজী একবার তির্যক দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে।

মেয়েটী বল্লে, এসব তো আপনাদেরই আশ্রম। এখানে সর্ব মানুষের অবারিত দ্বার। আমরা সবাই যে এক, কেউ তো পর নই। তাই তো কর্ণেল সাহেব যখনই সময় পান ছুটে ছুটে আসেন। কি যে শান্তি তিনি পান এখানে!

ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড এক গরু দেখে সুবর্ণ কিছুতেই তার কৌতূহল রোধ করতে পারছিল না। ফস্ করে বল্ল, গরুটা তো বেশ শান্ত!

সুবর্ণর কথার ধরণে মেয়েটী আঘাত বোধ করলো, অন্তত সেইরকম মনে হলো। বল্লে, গরু আবার কোথায়? ও যে শ্যামা মা! কেমন কৃষ্ণ রং দেখেছেন? এমন রং মায়ের ছাড়া আর কার আছে? রোজ ইনি আসেন এখানে। প্রভুর পদসেবা নিয়ে যান।

বিস্মিত সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, রোজ আসে এখানে?

—হ্যাঁ, ঠিক দুটোর সময়। প্রত্যহ আমরা ওঁর পদস্পর্শ করে ধন্য হই।

উদ্গত হাসি রোধ করা সুবর্ণর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তবু অপূর্বর চোখের ইসারায় কোনো মতে সে চুপ করে রইলো। অপূর্ব বল্লে, মা আমার সাক্ষাৎ শ্যামা-মায়ের অবতার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এখানে ঢুকবার সময় দেখেছি মায়ের ও চোখে দিব্য দৃষ্টি। সে সময় একবার তিনি চক্ষুরুন্মিলন করেছিলেন কিনা।

বাবাজী ও তাঁর ভৈরবী একবার চাইলেন অপূর্বর দিকে, কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। লোকটা ব্যংগ করছে না তো? বাবাজী বল্লেন, হিন্দুর কাছে গো-মাতার চেয়ে পবিত্র কিছু নেই। শাস্ত্রে আছে বেদ উপনিষদে আছে গো-স্পর্শ করলে মানুষের অশুচি কাটে। গো-ময় মালিন্য দূর করে, গো-মূত্র পবিত্রতা আনে, রোগ দূর করে। গোদুগ্ধ কান্তিদান করে, প্রাণ বাঁচায়। হিন্দুর কাছে গো-মাতা পূজ্য। গো-স্পর্শ করে তাই আমরা ধন্য হই। গো-সেবা আনন্দ বর্ধন করে। গো-ময় গো-মূত্র সেবন করলে মানুষ স্বর্গের অধিকারী হয়।

বাবাজী যখন কথা বলছিলেন, অপূর্ব তখন নয়নভরে আত্মানন্দজী মহারাজের প্রচারসচিবকে লক্ষ্য করছিল। রূপ যেন তার ফেটে পড়ছে, চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর, বোধ হয় কিছুটা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। পরণে তাঁর অতি সূক্ষ্ম গৈরিক বস্ত্র ও অন্তর্বাস। এতক্ষণে কর্ণেল সাহেবের পরম শান্তির কারণটা

বুঝতে পারলো অপূর্ব। লোক মুখে কিছুটা জানা ছিল তার, সন্দেহটা ভঞ্জন করে নিল সে।

ষ্টেশনের ধারেই বাজার। চালের কন্ট্রোলের দোকানের সামনে বিরাট বুভুক্ষু জনতা। মেয়েদের লাইন। সমস্ত শহর ঝেঁটিয়ে এসেছে উপবাসী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মেয়েরা—শুধু এ শহর থেকে নয়। আশ পাশের অনেক শহরতলী থেকেও তারা এসে জুটেছে আহার্য সংগ্রহের আশায়। সারির পর সারি—বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে সারি। পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো অপূর্বর গাড়ী। বুভুক্ষু জনতার কোলাহল তাকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হলো না। সুবর্ণ একবার চাইলো অপূর্বর দিকে।

সুবর্ণর এ দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বাকি রইলো না অপূর্বর। ঘাড় ফিরিয়ে সে বল্ল, কোথায় নয় এ দৃশ্য! যুদ্ধের যুগে দুনিয়ার সর্বত্র এই অবস্থা। মৃত্যু অনাহার বুভুক্ষা—এই হলো আজকের দিনে স্বাভাবিক। তা রোধ করা অসম্ভব। বরঞ্চ আমি ভাবছি—

কথাটা সে শেষ করলো না।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, কি ভাবছেন?

অপূর্ব হাসলো, বল্লে, আপনার হয় তো ভালো লাগবে না কথাটা। এই এতগুলো লোক না খেয়ে কষ্ট করে যা সংগ্রহ করতে এসেছে, তাতে তাদের পেট ভরবে না, অথচ ঠিক এই রকম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ফের আহার্য সংগ্রহ করতে হবে। আমি ভাবছি, এদের মোটা টাকা দিয়ে লেবার কোরে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। সেখানে খাটবে, টাকা রোজগার করবে। আহার্যের জন্য ভাবতে হবে না, কর্তৃপক্ষই ব্যবস্থা করে দেবে।

—লেবার-কোরেরও কণ্ট্রাক্ট নিয়েছেন বুঝি? সুবর্ণ সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলো।

নিই নি এখনো, ওটাও বাদ থাকে কেন? অপূর্ব হাসলো। হাসিটা ভালো লাগলো না স্বর্ণর।

কোলকাতায় ফেরার কিছুদিন পরেই স্বর্ণর বিয়ে হয়ে গেল অপূর্বর সংগে। স্বর্ণ বাধা দিল না, বাধা দেবার শক্তি তার অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল।

সেনহাটির জমিদার বাড়ীতে দুর্গতদের ভোজের আয়োজন হচ্ছে। দুপুর-বেলা খেতে দেওয়া হবে। রুক্মিণী শুনলো কথাটা। প্রসাদদাস মরেছে, চরণ কোথায় চলে গেছে, ভিটেটা খালি। উঠোন খাঁ খাঁ করছে। সেদিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেল্ল রুক্মিণী। তারপর পা বাড়িয়ে দিল পথে।

ফটকের পাশেই সারি হয়েছে। এক কোণে বসেছে রুক্মিণী। তার পাশেই আছে সৌরভী—কাঁকনতলা গ্রামের স্বৈরিণী মেয়ে। এখন সে ফুরিয়ে এসেছে। এককালে জৌলুশ ছিল, এখন ক্ষয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে—যেন গিল্টি উঠে গিয়ে পিতল বেরিয়ে পড়েছে। আগে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট থেকে জমাদার পর্যন্ত সবাই ওর অনুগ্রহ কুড়িয়ে চলতো, এখন কেউ তার দিকে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করে না। সৌরভীর তাই সবার ওপরই আক্রোশ। সেটা সে প্রকাশ করে না সর্বদা, চাপা রাখে স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতার আড়ালে।

খাওয়ার শেষে রুক্মিণী যখন চলে যাচ্ছিল, নায়েব এসে আটকালো।

—কি নাম তোর?

—রুক্‌কিনি।

—বেশ নাম, থাকিস কোথায়?

রুক্মিণী প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রসাদদাসের মৃত্যু চরণদাসের গৃহত্যাগের কাহিনী শুনে সমবেদনায় নায়েব গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করে।

বলে, 'তুই থাক এখেনে, কাজ করবি খাবি।' প্রসাদদাসের খাজনা কিছু বাকি-বকেয়া আছে, তা তুই এখেনে থেকে গায়ে-গতরে খেটে দিস।

রুক্মিণী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। এদের করুণা তাকে হতভম্ব করে দেয়।

উঠানের বড় ঘরে মালতী বিন্দু কুসুম এদের শোবার জায়গা। রুক্মিণীর সেখানে জায়গা হয় না। গোয়ালের পাশের একটা খড়ের ঘরে থাকতে বলা হয় তাকে।

সন্ধ্যে হতে না হতেই কাঁকনতলার জন্য রুক্মিণীর মন কেমন করে। কি অদ্ভুত অনুভূতি সেটা—কে আছে তার কাঁকনতলায়? পেটের ছেলেটা পর্যন্ত নেই। অনাহারে শুক্‌নো পেটে সহজ মনের অবলুপ্তি ঘটাই স্বাভাবিক, মন কেমন করাটা এখন বিলাসিতা। তবু কেমন অস্বস্তি বোধ হয় তার। কোথায় এলো সে, বিশাল বিরাট বাড়ী, দেওয়াল থামের আড়ালে আড়ালে কত কি রহস্য! রুক্মিণী স্বভাবত বোকাটে ও নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। বয়স তার বেশী নয়। আঠারো বিশের কাছেই। রংটা চকচকে বলাই চলে। অনাহারে কৃশতায় রূপ তার আরো বন্য ও ধারালো হয়ে উঠেছে।

মালতী এসে জিজ্ঞাসা করলো, কি নাম তোর?

নাম শুনে বল্ল, আর উপোস দিয়ে মরতে হবে না তোকে, এখেনে কাজ করে সুখ পাবি।

বোধ হয় তাই। রুক্মিণীর তাই মনে হয়। তবে ভাল লাগছে না তার। তীক্ষ্ণ নির্জনতা থেকে সে এসে পড়েছে এক উর্মিমুখর জনস্রোতে। যেন সে ভেসে যাবে, রোধ করতে পারবে না নিজেকে। ভালো লাগে না তার। এক বন্দীত্বের স্বাদ পায় যেন। এদের ভরা পেটের গল্প মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, এদের ক্ষুধামান্দ্যের আবহাওয়া আকালপীড়িত মানুষের মনে ঝিম্ ঝিম্ ধরায়। এর চেয়ে ভালো অনাহার।

তবু কাঁকনতলায় সুখ নেই। সুখ নেই সেখানে। সেখানে মানুষ উন্মাদ।

সেখানে দুঃখের বন্যা বিপদের বৃষ্টি। সেখানে দুঃসহ অনাহার, নিষ্ঠুর মৃত্যু। সেখানে সে নিধু কোবরেজের মৃতদেহের পরিণতি দেখেছে। বাইরে পড়েছিল মড়াটা, খোলা ঘর থেকে ক্ষুধার্ত শৃগালেরা টানাটানি করে বাইরে এনেছিল। আধখাওয়া করে রেখে দিয়েছিল। বিভৎস সে দৃশ্য ঃ চোখ দুটো নেই, নাকটা থাবলানো, কাঁধের অর্ধেক উধাও, পেট ছিঁড়ে নাড়ি ভুঁড়ি বাইরে এনেছে শিয়ালে। পচা গন্ধে ভরে উঠেছিল বাতাস। আর সেখানে মরেছে তার বুড়ো শ্বশুর প্রসাদদাস। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে মরণকে সম্মুখে রেখে তিল তিল করে সে মরেছে। কথাটা ভাবতেও রুক্মিণী শিউরে উঠে, দেহের হাড়গুলো হিম হয়ে আসে।

অন্ধকার রহস্যময় রাত্রি। যেন এক শংকিত মৃত্যু-গুহা। রুক্মিণীর কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। ফস্‌ফরাস মাখা ঘর্মবিন্দু অন্ধকারে চিক্ চিক্ করে। আচমকা ঘুম ভেঙে গিয়ে তার ভয়ানক কষ্ট হয়। দম আটকে যায়, উঠতে পারে না, সমস্ত দেহ যেন বিবশ। কে যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাকে চেপে ধরেছে। তার সমস্ত শরীরের চাপে রুক্মিণীর দেহ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

অচেনা কুৎসিৎ একটা লোক খানিক পরে কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছতে মুছতে খড়ের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। চুলে তার তখনো একটা খড় লেগে থাকে।

বিকেলে রুক্মিণী চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লো। এক ক্রোশ দূরে কাঁকনতলা উচু নিচু পথ—বন্ধুর অসমতল। রুক্মিণী হেঁটে চল্ল। পা দুটো যেন টল্‌ছে।

বিকেলের রং কালো হয়ে এলো। আঁধার নামলো ক্রমে। অনেক দূরে জোর বাতির আলো দেখা যায়, ওদিকে বোধ হয় উড়োজাহাজ নামার উঠোন তৈরী হচ্ছে। রুক্মিণী জোরে পা চালায়, কিন্তু হাঁটতে পারে না, বড় ক্লান্ত লাগে শরীরটা।

পথ এদিকে খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। সরু পথের পাশেই ঝোপ। হঠাৎ

আচমকা হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে রুক্মিণী তাকালো পাশে। সৌরভী আসছে ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে, সংগে একটি লোক। লোকটা রুক্মিণীর অচেনা নয়, লড়াইয়ের ঠিকাদারীর কাজে কাঁকনতলায় নোতুন এসেছে।

লোকটা সৌরভীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে চলে গেল।

রুক্মিণীকে দেখে সৌরভী অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, সন্ঝে বেলায় কোথা যাচ্ছিস রুক্মিণী ?

—গাঁয়ে।

রুক্মিণী দাঁড়ালো। সৌরভী বল্লে, কাপড়টা ছিঁড়ে দিয়েছে লোকটা—আবদার দেখে গা জ্বলে।

বলে সে ফস্ করে টান দিয়ে সবটা কাপড়ই খুলে ফেলে। একেবারে উলংগ হয়ে যায়। ঝোপের পাশের অন্ধকার নির্জন পথে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, তবু সৌরভীর কাণ্ড দেখে রুক্মিণীর লজ্জা পেলো। বিহ্বল হয়ে গেল। সৌরভী ওর খুব কাছে এসে বুকটা উঁচু করে ধরে ওকে দেখিয়ে বল্লে, হতভাগা মিন্সের হাতে বাঘের মত নোক। জ্বলুতি লেগেছে।

দিন ফিরছে সৌরভীর। এতদিন পরে হৃতসর্বস্ব কাঁকনতলার শব্দহীন মৃত্যু-স্তূপে সৌরভী বোধ হয় খুঁজে পেয়েছে তার জীবনের সমারোহ। মিলিটারীতে ছেয়ে ফেলেছে গ্রাম। সমস্ত জনপদ উজাড় করে ঠিকাদাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে সুযোগের সন্ধানে : ধান কেনার উদ্দেশ্যে, লেবার কোরের জন্যে খাটিয়ে মেয়ের উদ্দেশ্যে, সৈন্যদের মনোবিলাস সার্থক করার জন্যে স্ত্রীলোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কণ্ট্রাক্টরের সহায়ক হয়েছে সৌরভী। দিন দিন মোটা হচ্ছে মেয়েটা। বেশ দুটী খেতে পায় আজকাল। জমিদার বাড়ীতে সে-ও কাল খেতে গিয়েছিল, না গেলেও পারতো অবশ্য। কি কারণে গিয়েছিল কে জানে। রুক্মিণীর ওকে নির্লজ্জা বলে মনে হলো। তবে সে জানে এইটাই তার স্বভাব। কলংকের কথা পর্যন্ত সে সবাইকে গর্বভরে বলে বেড়ায়।

তারপর অনেক দিন পরে হয় তো একদিন এলো এক গুড্‌স ট্রেন। ওয়াগনের পর ওয়াগন ভর্তি হয়। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে যায়। শুধু ছিটকে পড়া ধানের দু-একটা অংকুর বেঁচে থাকে। মহকুমা থেকে জেলা, জেলা থেকে বিভাগ, বিভাগ থেকে গোটা প্রদেশ, এমনি করে সুদূর গ্রামের ধান কোথায় চলে যায়। রুক্মিণীরা সেদিকে চেয়ে থাকে নিঃশ্বাস চেপে। নিঃশ্বাস ফেলার অধিকার তাদের নেই।

মহকুমা শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলে রুক্মিণী। চুলে তার তেল নেই। রুক্ষ চুল হাওয়ায় ওড়ে। জট পড়েছে তাতে। পরণের কাপড়ে অসম্ভব ময়লা ও দুর্গন্ধ। রুক্মিণীর রুপোর মত রং রোদের তাপে তামাটে হয়ে এলো।

অল্প অল্প খোরাক জোটে, পচা কটু খাদ্য। সহজ মানুষের উদ্বৃত্ত অপচিত ভুক্তাবশেষ অবশেষে অখাদ্য হয়ে যায়। কুকুরের সংগে ভাগ করে তাও খেতে শুরু করেছে মানুষ। দুদলে তাই ঝগড়া বেধে যায় মাঝে মাঝে। ক্ষুধার্ত উপোসী কুকুরগুলো আক্রোশে ঝাপিয়ে পড়ে মানুষের ওপর। একদিন এ খাদ্যে ছিল তাদেরই একায়ত্ত অধিকার। আজ তা থেকে তাদের বঞ্চিত করলে চলবে কেন ?

ক্রমে তাও জোটে না। কুকুরগুলো হাড্ডিসার হয়ে কেঁও কেঁও করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের চামড়ায় পোকারা বাসা বাধে—লোমগুলো উঠে যায়। সর্বাংগে ঘা থিক থিক করে।

শেষকালে মানুষ শহর ছেড়ে বেরুলো বড় শহরের উদ্দেশ্যে। যেখানে পাওয়া যাবে খাদ্য। যেখানে নেই দুর্ভিক্ষ। যেখানে মানুষ মানুষকে খেতে দেবে ভালো আহার্য। ভিক্ষা যদি করতেই হয় তবে সেখানেই তারা করবে।

দীর্ঘ মিছিল বের হলো। মহকুমা শহর ছেড়ে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে ভুখ-মিছিল এগিয়ে চল্ল। যেন দীর্ঘ এক রেজিমেণ্ট চলেছে মার্চ করে। রুক্মিণীও

কণ্ট্রাক্টর সৌরভীকে টাকা দেয়। আরো উপার্জনের উপায় করে দেবে বলেছে। দুহাতে পয়সা ছড়াচ্ছে লোকটা। লেবার কোরের জন্য মজুর চাই— শক্ত কর্মঠ মেয়ে-মজুর।

ঘরে একদানা ক্ষুদ নেই। কেনই বা রুক্মিণী ফিরে এলো? লেবার-কোরে যাবে নাকি কাজ করতে? কিন্তু ভরসা পায় না। কেউ তো এখনো যায়ও নি এখান থেকে।

কাঁকনতলা ছেড়ে রুক্মিণী গেল মহকুমা শহরে। ওখানে যদি আহার্য মেলে। কিন্তু ওখানকারও সেই অবস্থা। ভিক্ষা করবে নাকি? কিন্তু হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা লাগে। দুর্ভিক্ষের আগুন এখনো স্নায়ুতন্ত্রে বিকার আনতে পারে নি। তবে কাঙালী ভোজের পংক্তিতে বসতে বাধে না। সেদিন এক ভদ্রলোক হাতে একটি ডবল পয়সা গুঁজে দিয়ে গেলেন, ধন্যবাদ তাকে।

খালি পেটে আগুন জ্বলছে। ইন্ধন চাই, নইলে সব পুড়ে ছারখার হবে কত দিন কত রাত রুক্মিণী আর উপবাস সহ্য করবে বলো?

মহকুমা শহরের ছোট্ট রেলষ্টেশন। ছোট্ট একটি প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মে শেডের নীচে ধান ও চালের বস্তা স্তূপীকৃত। কতদিন ধরে যে পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। তলার বস্তাগুলো বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হয় হোক, তবু ও চাল তোমার জন্য নয় রুক্মিণী। ওদিকে তাকিও না তুমি।

মধ্যে মধ্যে শহরের দিক থেকে মোটর লরী আসে। দূর গ্রামান্তর থেকে বস্তাভরা ধান চাল এনে জমা করে দিয়ে যায় প্ল্যাটফর্মে। ষ্টেশনের কর্মচারী বস্তার ওপর ত্রিপল ঢাকা দিয়ে রাখে। তারপর কতদিন যে পড়ে থাকে ও ভাবে কেউ তার খোঁজ রাখে না। নীচের বস্তাগুলো পচে যায়। প্ল্যাটফর্মের মাটিতে দু-একটা ধান অংকুরিত হয়। অন্ধকারে গোপনে চোরের মত নিঃশব্দে এসে দু-একজন বুভুক্ষু উপবাসী বস্তায় খোঁচা মেরে চাল বার করে আঁচলে পোরে। ধরা পড়ে মার খায়।

ওদের মধ্যে একজন। ওরা হাঁটে একসংগে, বিশ্রাম করে একত্র। দুর্ভিক্ষে সব একাকার করে দিয়েছে ওদের।

অন্ধকার নেমে এলে ওরা সারি সারি শুয়ে পড়ে। মোক্ষদা বলে, গাঁয়ে আর ফিরছি না আমি। অবস্থা ভালো হলেও না।

রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করলো, আকাল চলে গেলেও না?

না, মোক্ষদা অন্ধকারে ঘাড় নাড়লো, মায়ের পেটের ভাই, সেই হয়েছে শত্তুর।

সুখে দুঃখে ভাইয়ের সংসারে এতকাল কেটেছে তার। ভাইয়ের সংসারে আছে তার ভাজ, ভাই-পো আর সে। বউয়ের কন্না করা, সংসারের ঝক্কি নেওয়া, ভাই পো-টাকে বুকে পিঠে মানুষ করা যা কিছু ঝঞ্ঝাট মোক্ষদার ওপর দিয়েই গেছে। কি কাল আকাল এলো দেশে। ক্ষেতে যেটুকু ধান হতো, তা যথেষ্ট নয়। মাস ছয়েকও যায় না। মহাজনের কাছ থেকে কিনতে হয়। ঘটি গামলা বেচে চল্ল কিছুদিন। এখন আর চলে না কোনো মতে। বিধবা মোক্ষদা সংসারে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। ভাই মুখ গোমড়া করে থাকে। বউ গঞ্জনা দেয়। দুদিন বাড়ীতে উনুন জ্বললো না। মায়ের পেটের ভাই, সেও মুখ খুল্লো। মোক্ষদা তাই রাগ করে বেরিয়ে পড়েছে।

ওদের থেকে দু হাত দূরে বুড়ী হারানী বক বক করছে বসে। ছেলের উটাকে গালাগালি দিচ্ছে। বউটা বসে আছে তার পাশেই। নতমুখী নর্বাক একটী মেয়ে। একটা ভীরুতার লজ্জা তাকে ঘিরে রয়েছে। াসখানেক হলো হারানীর ছেলেটা ঠিক চরণদাসের মত ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। বুঝতে অবশ্য কারুরই বাকি নেই যে মা-বউকে াওয়াবার দায়িত্ব এড়াবার জন্যেই সে চলে গিয়েছে। হারানী বুড়ী বউটার পর ঝাল ঝাড়ে সর্বদা। বউটা ভালোমানুষ। নিঃশব্দে শুনে যায় গালি— কানো প্রতিবাদ করে না। প্রস্তর মূর্তির মত নিস্তব্ধ একটী ভাষাহীন মুখ।

ভাবলেশস্পন্দনবিহীন। হারানী তাতে আরো জ্বলে ওঠে। একতরফা ঝগড়ায় আনন্দ নেই। ঝগড়া তাতে জমে ওঠার অবকাশ পায় না।

একটু দূরেই আছে রহম চাচা, হিরু মিঞা, পাঁচু মণ্ডল, বসির আমেদ, নিবারণ। বিড়ি ফুঁকছে নিবারণ। ওর সংগীরা সবাই শুয়ে পড়েছে। সে কিছুতেই ঘুমুতে পারছে না। ছটফট করছে। হারানীর বকুনির জন্যে হোক বা অন্য কারণে তার চোখে ঘুম আসছে না। অন্ধকারে তার চোখ জ্বল জ্বল করছে। বিড়ির আগুনটার মতই। পেটে ভাত যায় না, নেশাটা কিন্তু ঠিক আছে। একটু পরেই বিড়িটা শেষ হয়ে এলো। পর পর তুটো জোর টান মেরে টুকরোটা ছুঁড়ে দিল নিবারণ।

ভোর হতে না হতেই ওরা উঠে পড়ে। ছেঁড়া কাঁথা পুঁটলী নিয়ে আবার যাত্রা, আবার অনেক যাযাবর ইতিহাস। দেখা গেল তুটী লোক কম পড়েছে দলে। হারানীর বকুনি আজ থেমেছে। কাকে সে বক্‌বে? অন্যদিন ভোর থেকেই শুরু হয় বকুনি। আজ সে আর ভাষা খুঁজে পায় না। হয়ত বকুনির পুঁজি তার শেষ হয়ে গেল।

আর নিবারণকেও দেখা যায় না দলে।

ভুখ-মিছিল অবশেষে কোলকাতায় এসে থামলো। বিরাট শহর। জীবনযাত্রায় কি সমারোহ। শহরের প্রাণ-স্পন্দনে কি চাঞ্চল্য। মানুষের ভিড়ে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তবু কোলকাতাই তাদের আশ্রয়ঃ খাদ্যের জন্য, জীবনের জন্য—একথা মনে হতেই সব সহজ হয়ে এলো। সহজ হয়ে এলো ভিক্ষার আওয়াজ তোলা।

তুর্ভিক্ষ ওদের স্নায়ুকে বিবশ করে রেখেছে। আজকাল এক মুঠো ভাতও জোটে না। প্রথম প্রথম গৃহস্থ-বাড়ী থেকে ডাক আসতো, লোকে ডেকে

নিয়ে গিয়ে খেতে দিত। ওদের খেতে-না-পাওয়া কংকালসার দেহ গোড়ায় গোড়ায় লোকের সহানুভূতি টেনে আনতো। ক্রমশ বুভুক্ষুরা ছেয়ে ফেল্ল শহর। তাদের ক্ষুধার্ত দাবী সুস্থ মানুষদের বেশী খেতে পাওয়ার সৌভাগ্যের জন্য ভীত করতে লাগলো।

রুক্মিণীদের দলের অনেকেই কোথায় ছিটকে পড়েছে শহরে। রুক্মিণী, মোক্ষদা, পাঁচু মণ্ডল আর হারাণী এক সাথে আছে। বাজারের আশে পাশে ঘুরে কপির পাতা পচা আলু-পেঁয়াজ-যা পাওয়া যায় তা দিয়ে ওদের একটা খাদ্য তৈরী হয়। ছুটো ইট দিয়ে উনুন গড়া হয় পথের পাশে, শুকনো কাঠি দিয়ে আগুন ধরানো হয়, মাটির হাঁড়িতে আহার্য সিদ্ধ হতে থাকে। একটা ঝাঁঝালো ধোঁয়া উনুন থেকে বেরিয়ে এসে পথচারীদের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

—মাগীগুলোর উৎপাতে রাস্তা চলা দায় হয়ে উঠেছে, কেউ একজন মন্তব্য করে।

তার সংগী সেকথায় কান না দিয়ে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লে, খেতে পায় না, ছুঁড়িটার চেহারা দেখেছিস। বলে সে আঙুল দেখায় রুক্মিণীর দিকে।

হায় রুক্মিণী! দুর্ভিক্ষের আগুনে তোমার রূপ পুড়ে গেছে, অনশনে তোমার লাবণি-পুষ্ট দেহ শুকিয়ে গেছে, সূর্যকর তোমার বর্ণ-ঔজ্জ্বল্য অংগার করে দিয়েছে। তবু তাই দেখে এরা লুব্ধ হয়ে উঠেছে!

রাত্রি হলে মোক্ষদার পাশাপাশি শুয়ে আবার গল্প। মোক্ষদার ঘরের কথা রুক্মিণী শুনতে চাইলে মোক্ষদা রোজকার মত কত খুঁটিনাটির কথা বলে।—আর বলিস নে তুই, ছোট্ট ভাইপোটা কি বজ্জাত! বাড়ীর কারুর কথা শুনবে না, আমারই কথা যা শুনতো একটু—

—তুমার ন্যাওটা ছেলো বুঝি দিদি? রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করলো।

—ন্যাওটা বলে ন্যাওটা। বউটা বিইয়েই খালাস। পেট থেকে পড়ে অবধি আমার কোলে কোলেই তো মানুষ।

—তুর কিন্তুক চলে আসা উচিত হয় নি মোক্ষদা দিদি। এদ্দিন ছিলি তো উদেরি সংসারে। ভাই ভাই-বউদের যদি একমুঠ জোটে তো তুরও কি জুটতো না?

—ও পোড়ার সংসারে সাত ঝাড়ু। তুই আর বকিস না বাপু, গা জ্বলে শুন্‌লে, মোক্ষদা একটা ঝংকার দিয়ে ওঠে, নিজের মায়ের পেটের ভাই, সে-ও তো কম মুখ শোনায় না। ফট্‌করে বল্লে. আমার নাকি চরিত্তির খারাপ। তোদের সংসারে প্রাণপাত করে মরছি, এখন বলবি বই কি ওকথা। তাড়াতে হবে তো? পোড়া সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে, আর ফিরছি না। যা হবার হয় হোক এখানে।

রাত্রি ক্রমে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। পথচারীদের ভিড় হাল্‌কা হয়ে আসে। যাত্রীবিরল শেষ ট্রামটীও চলে যায়। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার আরো জমাট বাধে। মোক্ষদার ঘুম আসে চোখে। ঘুমিয়ে পড়ে রুক্মিণী। সামনের বিড়ির দোকানের লোকটা দোকান বন্ধ করার সময় মুখ বাড়িয়ে ফুটপাথে নিদ্রিতদের দিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। অন্ধকারেও সে ঠিক ঠাহর করে নেয়। মোক্ষদার পাশে এসে নিঃশব্দে তার গায়ে আঙুলের টিপ দেয়। মোক্ষদা ধড়মড় করে উঠতেই সে তার একটা হাত মুঠোর মধ্যে পুরে হাল্‌কা টান মেরে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর দুজনে ঢুকলো দোকানে। বাইরের ঝাঁপটা আগেই সে বন্ধ করে দিয়েছিল।

গভীর রাত্রে রুক্মিণী পার্শ্বপরিবর্তন করে। পাশের জায়গাটা অনেকটা খালি পেয়ে আরামে সে হাত পা ছড়িয়ে দেয়।

বুড়ী হারানী মরলো একদিন। রোজকার মত অনেক রাতে শুয়ে সকালে যখন সবার ঘুম ভাঙলো, দেখা গেল বুড়ীটা মরে রয়েছে কাঠ হয়ে। কখন মরেছে রাত্রে কেউ টের পায় নি।

মোক্ষদা ও রুক্মিণী অন্য ফুটপাথে সরে গেল। দুপুর পর্যন্ত মৃতদেহ পড়ে থাকলো।

দলের পুরুষরা কোথায় ভেগেছে কে জানে। মরলো কি অন্যত্র আড্ডা গাড়লো সে খবর ওরা জানে না। রুক্মিণী মোক্ষদা একত্র আছে।

নিকটে এক গলিতে খুলেছে লংগরখানা। অদ্ভুত তাদের পরিবেশন—চাল ডালের ক্ষুদ আর কুমড়োর খোসা মিশিয়ে একটা অপূর্ব খাদ্য বিতরণ করা হয়। পেট ভরে খায় বুভুক্ষুরা।

লংগরখানার খাদ্য ধাতস্থ হয়ে এলো। গোটা দুর্ভিক্ষটাই ধাতস্থ করে ফেলেছে রুক্মিণী-মোক্ষদা, কই তাদের তো কিছু হলো না। মাঝে মাঝে বিড়িওলাটা খাবার কিনে দেয় মোক্ষদাকে, সে তা থেকে ভাগ দেয় রুক্মিণীকে।

বিড়িওলাটার খুব দয়া, নারে? মোক্ষদা একসময় জিজ্ঞাসা করলো।

রুক্মিণী অন্যমনস্কের মত জবাব দিল, হুঁ।···বিড়িওলার দয়াটা কেমন স্বার্থপরের মত, উচ্ছ্বসিত কিন্তু আন্তরিক নয়। অন্তত রুক্মিণীর তাই মনে হয়।

সন্ধ্যে হতে না হতেই ফুটপাথে পা ছড়িয়ে বসে কোমর থেকে একটা চিরুণী বার করে মোক্ষদা বল্লে, দে দিকি চুলটা আঁচড়ে। না আঁচড়ে আঁচড়ে কি ছিরিই হয়েছে চুলের। উকুন থাকলে বার করে দিস।

রুক্মিণী চুল আঁচড়ে দেয়। মোক্ষদা বললে, রোস, একটু তেল নিয়ে আসি।

বিড়িওলার দোকান থেকে সে একটা শিশি নিয়ে এলো। রুক্মিণী তার চুলে তেল মাখিয়ে দেয় চপ চপ করে। তেল গড়িয়ে পড়ে কপালে। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে নেয় মোক্ষদা। রুক্মিণীর কেমন অদ্ভুত লাগে এ সময়, খুব অদ্ভুত। দুর্ভিক্ষের সংগে যেন মোক্ষদার প্রসাধনের কোনো সামঞ্জস্য নেই। ওটা অর্থহীন।

হঠাৎ বৃষ্টি নামে। আচমকা এসে যাওয়া বৃষ্টি। কিছুক্ষণ প্রবল বেগে হয়। ফসল ভালো হয় এ বৃষ্টিতে। ফুটপাথে বন্যা বয়ে যায়। রুক্মিণীর হাত ধরে টানতে টানতে মোক্ষদা বিড়িওলার ছোট্ট দোকান ঘরটিতে আশ্রয় নেয়।

আর সেইখানেই সব পরিষ্কার হয়ে যায় রুক্মিণীর এতদিনকার দুর্বোধ্য সমস্যা, মোক্ষদার এতদিনের বন্ধ্যা জীবন-যাত্রার মাটি চিড় খেয়ে অংকুরিত হয়ে উঠেছে, এই সত্যটায় আর কোনো সংশয় থাকে না।

আজকের জলে ফসল ভালো হবে, ভবিষ্যদ্বাণী করে বিড়িওলা। দুর্ভিক্ষের দিনে কথাটা রোমাঞ্চ আনে মনে।

তারপর আরো কিছুদিন পরে সরকারী গাড়ী এসে নিরাশ্রয়দের ধরে নিয়ে গেল। রাজপথে যারা এসেছিল নীড় বাঁধতে, খোলা আকাশের তলে সহস্র জনতার ধূলিশয্যায় ছিল যাদের শয়ন, সরকারী ভোজনালয়ের অদ্ভুত খাদ্য ছিল যাদের নিত্যকার আহার্য, গভর্ণমেণ্টের লোক একদিন ধরে নিয়ে গেল তাদের। রুক্মিণী বাজারের পাশে দাঁড়িয়েছিল—মোক্ষদা সেই দিনই তাকে বিদায় করে দিয়েছে—ঝগড়া হয়েছিল বুঝি। সেও ধরা পড়লো।

লরীতে তুলে দিল রুক্মিণীকে। ওর মত আরো কত নিরাশ্রয়কে ধরে আনা হয়েছে। রুক্মিণী শুনলো তাদের নাকি গাঁয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গাঁয়ের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল রুক্মিণী।

মিলিটারী ট্রাকে তুলে দেওয়া হলো ওদের। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে চল্ল ট্রাক। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ক্রশ করে ট্রাক অন্য পথ ধরলো। নোতুন রাস্তা। মিলিটারী গাড়ী যাবার জন্যই সম্প্রতি তৈরী হয়েছে। শক্ত মজবুত। মসৃণ সমতল। ঝড়ের মত ট্রাক ছুটলো।

দূরে কাঁকনতলা।

রুক্মিণী নিঃশ্বাস রোধ করে রইলো। ট্রাক যত এগোয় রুক্মিণীর বুকের স্পন্দন আরো বেড়ে যায়। আট মাস হলো সে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছে।

দুধারে মাঠগুলি ভরে রয়েছে শস্যে। এত শস্য হয়েছে এবার। সুন্দর সতেজ শিষগুলো। গাছ নুয়ে পড়েছে শিষের ভারে। আর কয়েকদিন পরেই পাকবে। এবার তাহলে ভালো ফসল হয়েছে। দুর্ভিক্ষ আর থাকবে না তাহলে।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল কাঁকনতলা। থামলো না ট্রাক। ঝড়ের মত উড়ে চলেছে। থামলো যেখানে, সেটা অজানা একটা গ্রাম।

লেবার-কোরের রিক্রুটিং-ক্যাম্প। রুক্মিণীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো—সেখানে তারা খেতে পাবে পেট পুরে, কাপড় পাবে, থাকবার জায়গা পাবে। কোনো ভাবনাই রইলো না তাদের। কাগজে একের পর এক বুড়ো আঙুলের ছাপ পড়ে।

নোতুন সড়ক তৈরী হচ্ছে। উড়ো-জাহাজ নামবার অনেক উঠান তৈরী হচ্ছে। সেনা-বারিক গাঁথা হচ্ছে। লোক চাই, মানুষ চাই, শ্রম চাই।

লেবার-কোরে মন্দ লোক জোটে নি। সবাই মেয়েমানুষ—দুর্ভিক্ষে খেতে না পেয়ে যারা মরতে বসেছিল। ভালো আহার্য দিয়ে ওদের শিরায় শিরায় রক্তের স্রোতে অস্থিতে মজ্জায় পেশীতে শক্তি এনে দেবার পরিকল্পনা হয়েছে। লেবার চাই—নইলে যুদ্ধ জয় হবে না।

খোলা মাঠ। মাঠের পর মাঠ। জমিদার-চাষীদের টাকা দিয়ে জমি নেওয়া হয়েছে। শাদা ক্যানভাসের তাঁবু পড়েছে অসংখ্য। সৈন্যরা থাকে। ব্যারাকের পাচিল গাঁথা হচ্ছে। রুক্মিণীরা মিস্ত্রির কাজে যোগান দেয়। ভালো খাদ্য, ভালো কাপড়, ভালো বাসস্থান পেয়েছে তারা।

বাতাসে রুক্মিণীর আঁচল উড়তে থাকে। অনেকটা গা আল্‌গা হয়ে যায়। সৈন্যগুলো শিষ দিয়ে চীৎকার করে ওঠে। হাসে। রুক্মিণী তাড়াতাড়ি কোমরে আঁচল জড়িয়ে নেয় শক্ত করে।

বাতাস এসে দোলা দিয়ে যায় তার মনটাকেও। পরিবর্তন এসেছে তার

মনেঃ তার সর্বাংগে বন্যার বিপুল বেগ, মনের কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রুক্মিণী ঝক্‌মক করে ওঠে রুপোর মত।

সেনাবারিক গাঁথার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে আরেকটা সড়ক খোলার কাজ। লেবার-কোরের মেয়েদের তদারক করার জন্যে একজন নোতুন মেয়ে অফিসার এসেছে। মূল্যবান শাড়ীতে দেহাবৃত করে দামী হাই-হিল জুতা পরে রিষ্ট-ওয়াচ এঁটে ঘুরে বেড়ায় সে। মেয়েরা তাকে ভয় করে যমের মত। কি তীব্র দৃষ্টি তার চোখে।

ইন্দুমতীর মত অনেকটা দেখতে তাকে। কিন্তু ইন্দুমতী নয় নিশ্চয়। সে মরে গেছে। তুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে তার অবসান হয়েছে। সে নয় নিশ্চয়ই।

কানাকানি চলেঃ পলাশবনীর নোতুন জনপদ থেকে সে এসেছে। ওপাশে রেল-লাইন আর তার ঠিক এপাশে কঞ্চির বেড়া দেওয়া সার সার খোলার ঘর। তারই একটা থেকে একজন কণ্ট্রাক্টর তাকে আবিষ্কার করে এনেছে।

ইন্দুমতী নয়, তার মৃত্যু হয়েছে। তাকে তোমরা খুঁজে পাবে না।

ফসল কাটার দিন শুরু হয়েছে। মাঠে লোক পাওয়া যায় না। তুর্ভিক্ষে মানুষ উজাড় হয়ে মরেছে। চাষা ধান ফলিয়েছে, কাটার লোক কোথায়? যারা বেঁচে আছে, সেই সব মেয়ে-পুরুষরা প্রায় সবাই চলে এসেছে মিলিটারীতে।

নোতুন ফসলে মাঠ ভরে আছে। চমৎকার ফসল হয়েছে এবার। মানুষকে আর না খেয়ে মরতে হবে না। তুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে পুরোনো পৃথিবীর শেষ হয়েছে, নোতুন দিন আসছে। নোতুন দিনের আলো। বাতাসে পক্ক শস্যের রোমাঞ্চকর আঘ্রাণ।

খুশিতে উপচে পড়ছে দিন।

—পাঁচ—

জুলাই ১৯৪৫।

প্রেসিডেন্সী জেলের বৃহৎ লৌহদ্বার সশব্দে খুলে গেল—একদল রাজবন্দী মুক্তি পেলো এই মাত্র। অন্যান্য বন্দীদের সংগে বেরিয়ে এলো সুধীন। ফটকের বাইরে ভিড় জমেছিল কিছুটা—বন্দীদের আত্মীয় বন্ধুদের দ্বারা। কেউ এসে তাদের চুমু খেতে লাগলো, কেউ জড়িয়ে ধরলো আবেগে। দু এক জনের গলায় ফুলের মালাও বর্ষিত হলো। কিন্তু সুধীন বেরিয়ে এলো অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাতের মত। জনতার মাঝে তার পরিচিত কেউ ছিল না, কেউ চিনলো না ওকে।

প্রথম কারাবর্ষ তার কেটেছিল মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। শেষের বছরে তাকে আনা হয় কোলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে। ছাড়া পেয়ে সুধীন ভাবতে লাগলো কোথায় যাবে এখন। মেসোমশাইদের মুক্তির উল্লেখ করে সে একটী চিঠিও দিয়েছিল। অবশ্য সেটা কর্তব্য বোধে, কারণ মাসীমাদের মনোভাব সে জানতো। তাই জেল-গেটে পরিচিত কাউকেই দেখতে না পেয়ে সে বিস্মিত হলো না।

অবচেতন কোণে সুবর্ণর জন্য প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সে কি জানে তার কারাদণ্ডের কথা, তার কারামুক্তির কথা? সে নিজে ইচ্ছা করেই তাকে কিছু জানায় নি। সুবর্ণ কি তাকে এখনোও মনে করে রাখতে পেরেছে?

এখন নয়। এখনই তার সেখানে যাওয়া হতে পারে না। এই তিন বছর সুবর্ণর সংগে তার যোগাযোগ ছিল না। সেখানকার পরিস্থিতি তার অজানা। সুবর্ণর মিনতির প্রত্যুত্তরে সে বলেছিল একদিন, প্রয়োজন যেদিন হবে, সেদিন সে নিজেই যাবে তার কাছে। প্রয়োজন এখন হয় নি।

পকেটে একটা পয়সাও নেই। এই সপ্তাহের শেষে মাত্র তিন আনা পয়সা জমেছিল। আসার সময় সুধীন সেটা তারই মত একজন দুঃস্থ রাজবন্দীকে দিয়ে এসেছে।

শরীর দুর্বল। তা হোক, হাঁটার অভ্যাস একদিন তার খুবই ছিল। আজও সে পারবে হাঁটতে।

মিষ্টার মজুমদার বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারেন যে এবার নববর্ষের উপাধিবর্ষণের তালিকায় তাঁর নাম শোভা পাবে। কিন্তু অনেকগুলি নববর্ষ ও জন্মদিবস নিষ্ফল চলে যাওয়ায় তিনি এর জন্য সুধীনকে দায়ী করলেন। সেই তো এখানে থাকতো, এখান থেকে পড়তো; তার কোলকাতার ঠিকানা বলতে তো এখানকেই বোঝায়। বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের তা অজানা নয় নিশ্চয়। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন রায়েদের ব্যাপারে তাঁরা বিন্দুমাত্র মাথা-ঘামাবেন না। তাই সুধীনের আসন্ন মুক্তি-সংবাদে এই পরিবারে কোনো উল্লাস জাগে নি, অবশ্য উল্লাস জাগাবার গণতান্ত্রিক প্রশ্রয় দেওয়া হলেও পরাগ ছাড়া অন্য কেউ উল্লসিত হতো না।

পরাগই শুধু লাফিয়ে উঠলো সুধীদার মুক্তি-সংবাদে। সুধীনের চিঠিটা

বৈঠকখানায় পড়েছিল। মাসীমা নেহাৎ অবজ্ঞায় ফেলে রেখে দিয়েছিলেন। অবশ্য সবাই জেনেছিল খবরটা।

পরাগ সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ঢুকেই বৈঠকখানায় অতি পরিচিত হাতের লেখা চিঠি দেখে সাগ্রহে পড়ে নিল। তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বল্ল, সুধীদা ছাড়া পাচ্ছে ?

রমা নিস্পৃহভাবে জবাব দিলেন, তাই তো লিখেছে।

মায়ের নিস্পৃহতা লক্ষ্য করে পরাগ জিজ্ঞাসা করলো, আমরাই তাকে আনতে যাবো তো ?

—যাবি নাকি তুই ? রমা বিস্মিত হলেন, সুধী কি এমন দিগ্বিজয় করে আসছে যে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে হবে।

—বলো কি মা ? সুধীদা কি আমাদের পর ? পরাগ ব্যথিত কণ্ঠে বল্ল।

রমা চটে উঠলেন, ছেলের সংগে এ বিষয়ে তাঁকে তর্ক করতে হবে নাকি ? বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, পর হলে ভালো ছিল। আপন জনের মত কি ব্যবহার করেছে, কোন্‌খানে মুখ রেখেছে আমাদের, বল্ তুই।

পরাগ চুপ করে রইলো। রমা বলে উঠলেন, যেতে হবে না তোকে। সে নিজেই আসবে। এখন যে আমাদেরই দরকার ওর।

গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেলেন তিনি। পরাগের সুধীনের পক্ষ হয়ে কথা বলা শুনে গা জ্বালা করে।

সুধীন যখন এসে হাজির হলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মজুমদার পরিবারের পাচক ঠাকুর কোথায় গিয়েছিল, ফিরে এসে রান্না চড়াতে দেরী করে ফেলেছে, তাকে একচোট বকুনি দিয়ে রমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, এমন সময় হাজির হলো সুধীন। মাসীমা তাকে অভ্যর্থনা করলেন বিরক্তি ভরা মুখেই, যে মুখে একটু আগেই তিনি ঠাকুরের সংগে বাক্যালাপ সেরে এসেছেন। সুধীন পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে, আমার চিঠি পেয়েছিলেন তো মাসীমা ?

—পেয়েছিলাম বাবা, রমা জবাব দিলেন, ছাখো না, এমন সব ঝঞ্ঝাট এসে হাজির হয় এক সংগে যে কাউকেই পাঠাতে পারলুম না তোমায় নিয়ে আসতে।

সুধীন চুপ করে রইলো। রমা কৈফিয়ৎ দিলেন, কে একজন সায়েব টি-পার্টি দিচ্ছে, তাতে ওঁকে আর সুধাকে নাকি থাকতে হবেই। গাড়ীটা নিয়ে গেছে ওরা। বিনু গেছে তার পুরোনো প্রফেসরের বাড়ী—প্রফেসরের মেয়ের বিয়ে। সারাটা দিন আজ সে সেখানেই আছে। পরাগকে বলেছিলাম তোমার কথা, তা সে কোথায় যায় কি করে কাকেও কিছু বলে না তো।

—আমি বেশ আসতে পারলুম, সুধীন বল্লে, অসুবিধা কিছু হয়নি।

অসুবিধা হবেই বা কেন? টি-পার্টি বিয়ের ব্যাপার উপেক্ষা করা যায় না—নইলে সামাজিকতার হানি হয়, লোকে দুঃখ পায় ব্যথিত হয়। সুধীন তো ওদের যেতে অনুরোধ করে নি, শুধুমাত্র মুক্তির তারিখটা জানিয়ে দিয়েছিল।

মাসীমা বল্লেন, রোগা হয়ে গেছিস অনেকটা।—তারপর একটু হেসে, তা লোকে মোটা হতে তো যায় না জেলে। বোস, হাত পা ধুয়ে নে।

নিজের কাজে চলে গেলেন তিনি।

একটু পরেই সপুত্রক মজুমদার এলেন। বৈঠকখানায় একা বসে সুধীন খবরের কাগজ পড়ছিল। মিঃ মজুমদার ওকে দেখে খুশি হলেন বলে মনে হলো না। মুখে কেতাদুরস্ত হাসি টেনে বল্লেন, এই যে ছাড়া পেয়েছো দেখছি। হেল্‌থ অনেকটা রিড্যুশ করেছে। সুধীন এগিয়ে এসে নীচু হয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, মিঃ মজুমদার সশব্যস্তে সরে গিয়ে থাক্ থাক্ বলে ভিতরে চলে গেলেন।

সুধাংশুপ্রকাশ এগিয়ে এসে বল্লে, আরো অনেককে রিলিজ করা হবে। চিফ সেক্রেটারী বল্‌ছিল। এখন কি করবে ভাবছো?

জবাব দিতে উৎসাহ বোধ করছিল না সুধীন। বল্লে, কিছু ভাবিনি সে সম্বন্ধে।

সুধা বিলিতি কায়দায় কাঁধ দুটো 'শ্রাঁগ্' করে নিয়ে বল্লে, ভাব নি কি রকম? কিছু তো একটা করতে হবে। দেশ সেবায় পেট ভরে না, দেখলেও তো করে। বসো, স্যুটটা ছেড়ে আসি। বলে সেও চলে গেল।

আবহাওয়াটা ক্রমাগত করুণ হয়ে আসছিল। অনুত্তেজক, নিরুৎসাহ।

—হারামজাদা, উল্লুক!

মিঃ মজুমদার চীৎকার করে উঠলেন উপর থেকে।

সংগে সংগে আরো একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ যত সব উজবুক!

বোধ হয় ওরা কোনো চাকরকে বকুনি লাগাচ্ছে দস্তুরমাফিক কাজ হয় নি বলে।

বিনয়ের অভ্যর্থনাও কেমন বাসি ও নরম লাগলো। তবু পূর্ববর্তীদের চেয়ে সে একটু বেশী সময় নিল। এবং আলোচনা করে সুধীনকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেলো। তবু আলোচনা ভালো লাগলো না সুধীনের। যে বিষয়ে আলোচনা হলো, সুধীন সে বিষয়ে নেহাৎই আনাড়ি। যথা বি-সি-এস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যমূলক বিচার করা হয় কিনা, অধুনা কোন প্রভিন্স ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে বেশী সংখ্যক প্রতিযোগী পাঠিয়ে সফল হচ্ছে, আরো অনেক কথা। কিছু অবান্তর, কিছু নিরর্থক।

অসহ্য গুমোট বোধ হয়। সে চলে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সুধীন।

পরাগ এলো অনেক পরে। সুধীনকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে জড়িয়ে ধরলো। কেঁদে ফেলার উপক্রম, উঃ! সুধীদা তুমি? আমি জানতুম তুমি আজ আসবে।

ম্লানমুখে হেসে বল্ল সুধীন, আনন্দিত হলাম শুনে। শুধু তোরই অপেক্ষা করছিলুম।

পরাগ চুপি চুপি বল্লে, এবাড়ীতে কেউ চায় না তোমায়। কেউ তাই যায় নি তোমায় রিসিভ করতে। আমাকেও যেতে দেয় নি।

সুধীন বল্লে, তোদের যেতে তো বলিনি আমি, দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।

পরাগ বিস্মিত হয়ে বল্লে, আলিপুর থেকে এখানে এসেছো হেঁটে? এই রোগা ক্লান্ত শরীরে!

সুধীন হাসলো। বল্লে, পকেট আমার একদম খালি। একটি ফার্দিংও নেই।

রাত্রে সুধীনকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে এলো পরাগ। চোখে ঘুম আসে না কারুর। অনেক রাত অবধি বক বক চল্লো। পরাগ বল্লে, এখন কি করবে সুধীদা?

যা হয় কোরবো, সুধীন বল্লে, একলা নিজের জন্য ভাবনা কি? ভাবনা ছিল মায়ের জন্যে। অন্ধকার শেলে বসে কেবল মায়ের কথা ভেবেছি। নির্জন দালানে বেড়াতে গিয়ে কতবার দেখেছি অবিকল মায়ের দুটী চোখ। এখন আমি নিশ্চিন্ত। এবার জন্য ভাবি না।

পরাগ স্তব্ধ হয়ে রইলো। কিছু পরে বল্লে, বাবা মনে করেন তোমার জন্যে তিনি টাইটেল পেলেন না। গভর্ণমেণ্টের ধারণা আমরা নাকি তোমায় প্রশ্রয় দিই। তুমি কেন এলে সুধীদা? কালই চলে যেও তুমি। এখানকার হাওয়া বিষ, তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেবে।

তাই যাবো, সুধীন বল্লে, তোর সংগে দেখা করবার জন্যই আসা। তুই ছাড়া পৃথিবীতে এখন আমার আপন বলতে কেউ নেই।

পরাগ বল্লে, আরেকটা কথা জানিয়ে দেই তোমায়। সোনাদির খবর জানো? বছর দুয়েক হলো তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্বামী একজন মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর, শুধু তাই নয়, লোকটা চালের চোরা-কারবার করে অনেক টাকা

করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যারা ঐশ্বর্য ও বিলাস ভোগ করছে সোনাদির স্বামী তাদেরই একজন।

খবরটা জানা ছিল না। ভালোই হলো। পৃথিবীর নগ্নরূপে কতখানি তিক্ততা কতখানি বিষ আছে সেটা জেনে সুধীনের পক্ষে ভালোই হলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুধীন বল্লে, গোটাকয়েক টাকা দিতে পারিস। রেলের ভাড়াটা দেবো—

—আমার কাছে পঁচিশটা টাকা আছে, সব তুমি নিও সুধীদা। আমার কাছে থাকা মানে বাজে খরচ হওয়া। তোমায় দিলে ওটা সার্থক হয়।

পরাগের সমবেদনা সুধীনের মনকে আন্দোলিত করলো। বল্লে, অমন করে বলিস না। তোর সুধীদাকে ভুলিস না, এই শুধু আমার অনুরোধ।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বল্ল পরাগ, তোমরাই তো পৃথিবীর দুঃখজয়ী শ্রমিক। তোমাকে আমি ভুলবো না সুধীদা।

অতি ভোরেই সুধীন পরাগের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। এ বাড়ীতে সে অবাঞ্ছিত অতিথি, তাই সকালের আলো ভালো করে ফুটবার আগেই সবার অলক্ষ্যে সে বেরিয়ে এলো। পকেটে পরাগের দেওয়া পঁচিশটা টাকা রইলো।

বাড়ীটা হয়তো জংগল হয়ে আছে। মা যাবার পর কে-ই বা দেখতে আসবে ? মা যতদিন ছিল, হিরণ্ময়ী দেখাশোনা করতেন, মা যাবার পর হিরণ্ময়ী কি আর দেখাশোনা করতে পারেন—সে বয়স বা স্বাস্থ্য হয়তো আর নেই। পরাগ বলেছে, দুঃখজয়ী শ্রমিক তোমরা। সুধীনের হাসি পেলো, দুঃখজয়ী শ্রমিকই বটে।

পরাগ ভুল করেছে। দুঃখজয়ী নয়, দুঃখজীবী শ্রমিক।

দরজায় তালা দেওয়া। পিছন থেকে ঘুরে এসে খিড়কির দোরে ঠেলা দিতেই

খুলে গেল। ভিতরে এসে স্থধীন অবাক হয়ে গেল। বাঃ, দিব্যি পরিষ্কার তক্ তক্ করছে সব। ঘরটি কেমন সাজানো।

মা যতদিন ছিল, ততদিন ঠিক এমনি পরিপাটিই থাকতো সব। ঘরদুয়ার, তাক, স্থধীনের টেবিল সবই থাকতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্থধীনের চোখে জল এসে গেল, এ-সবই মায়ের হাতের স্থচারু কাজ। মায়ের একটি ছবিও নেই ঘরে। এইখানে এই নির্জন বাড়ীতে দিনের পর দিন মা একা কাটিয়েছেন—যতই থাক হিরণ্ময়ী, যতই থাকুক কাজলী, স্থধীনহীন মুহূর্তগুলি তাঁর নিঃসংগ বেদনায় ভারাক্রান্ত লাগতো। স্থধীন সব কিছুর ওপর হাত বুলিয়ে মায়ের স্পর্শ পেতে [illegible]লো। টেবিলের ওপর মোটা চিরুণীটা রয়েছে। স্থধীন এনে দিয়েছিল ওটা মায়ের চুল আঁচড়াবার জন্য। চিরুণীটা হাতে করতেই তার চোখ দিয়ে হু হু করে জল বেরিয়ে এলো। কিছুতেই সে রোধ করতে পারলো না কান্না। একটা ভীষণ দুর্বলতা এসে গ্রাস করলো ওকে, এরকম দুর্বলতা এর আগে সে কখনো অনুভব করেনি।

অসতর্ক মুহূর্তে দুর্বলতা মানুষকে কত অসহায় করে তোলে। আগষ্ট মাসের সংগ্রামে, কৃষকের বিচালি-শয্যায়, শাল-অরণ্যের গহন গভীরতায়, অন্ধকারে, ক্ষীণালোক নক্ষত্রমণ্ডিত নিঃসীম গগনতলে কোনো অবস্থায়ই গৃহের উষ্ণ পরিবেশ মায়ের অশ্রুক্লান্ত উৎকণ্ঠা কিছুই তাকে বিচলিত করে নি। আজ বড্ড বেশী মনে পড়ছে তাঁকে। এমনি ভাব জেলে থাকতেও হয়নি।

সারাটা দিন লেগেছে ট্রেনে আসতে। সমস্ত দিনের ট্রেন জার্নিতে শরীরে অবসাদ নেমেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। বিছানায় শুতেই চোখ দুটী জড়িয়ে এলো।

স্থধীদা! ডাক শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে

াড়লো। অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে। জানালাগুলি খুলে দিয়েছে কে। পূবের আলো এসে ঢুকছে। তিন বছর পরে এমন আলোভরা দিনটা তার খুব ভালো লাগলো।

এবং তার চাইতে আরো ভালো লাগলো শিয়রের পাশে দাঁড়ানো কাজলীকে। কাজলী জিজ্ঞাসা করলো, সুধীদা, কাল এসেছো বুঝি ?

হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যের পর। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তোদের সংগে দেখা করতে পারি নি। মস্ত বড় হয়ে উঠেছিস দেখছি।

—তুমি কত রোগা হয়ে গেছো সুধীদা!

সুধীন বললে, কতই আর রোগা হয়েছি! তিন বছরে পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড ওজন কমেছে। আমাদের কুঁড়েটির দেখাশোনা তুই করিস বুঝি ?

হ্যাঁ, কাজলী জবাব দিল, এই নাও চাবি। কাল খিড়কি দিয়ে এসেছিলে তো ?

রোদ্দুরে সবই যেন ঝলোমল করছে। আকাশ থেকে যেন সোনা গলে গলে পড়ছে। সকালের এই রোদ্দুরটা, গলিত স্বর্ণের বন্যার মত এই অকুণ্ঠিত সূর্যালোক আজ তিন বছর দুর্লভ ছিল সুধীনের কাছে। দীর্ঘ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে সূর্যকিরণ শত প্রচেষ্টাতেও প্রবেশ করতে পারতো না। কয়েদীদের কাছে প্রভাত-সূর্যের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়তেই সুধীন কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলো। জিজ্ঞাসা করলো, মায়ের শেষ সময়ে কে ছিল কাজলী ?

কাজলী বললে, আমি-দিদিমা ছিলুম।

—মা কি বলে গেছেন ? সুধীন জিজ্ঞাসা করলো।

—শুধু তিনটি কথা। শেষ মুহূর্তে বল্লেন, দুঃখজয়ী হোক সে। সেকথা পরে হবে, কাজলী বল্ল, তুমি এইবার উঠে চান করে নাও, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। তোমার খাবার ব্যবস্থা করি গে।

কাজলীটা কত বড় হয়েছে। তিন বছর আগে সে ছিল অস্ফুট, অর্ধোচ্চারিত সুধীন আজ ভালো করে একবার তাকালো তার দিকে। কত বড় হয়েছে কাজলী, কত বদলে গেছে। অবাক বোধ করলো সুধীন। কাজলীর কথার সুরে আদেশের ইংগিত। কাজলীর কাজল চোখ দুটোয় কত রহস্য জমা! তার দেহ ঘিরে আজ এসেছে সৌষ্ঠবের ব্যাকুলতা, যে সৌষ্ঠব প্রকাশের বেদনায় মর্মরিত। সুধীনের হাসি পেলো। কাজলীর মনের নাগাল আজ কি পাবে সে?

আজকের সকালটা যেন সব বদলে দিয়েছে। পৃথিবীটাই হয়ে উঠেছে নোতুন। কালকের যে পৃথিবীতে ছিল মজুমদার পরিবার, যে পৃথিবীতে ছিল স্বর্ণ, আজ তা লুপ্ত হয়ে গেছে অতীত দিনের গহ্বরে। আজ এখানে নেই মজুমদাররা, নেই স্বার্থশ্লিষ্ট বণিকবৃত্তি, আছে অনেক আলো, অনেক রোদ্দুর আর কাজলী।

সুধীনকে শুয়ে থাকতে দেখে কাজলী বল্লে, উঠলে না এখনো। বিছানা ছাড়তে দেরী হলে সমস্ত দিনটাই তোমার ভারী হয়ে থাকবে।

—এক কাপ চা নইলে উঠতে পারবো না কাজল, লক্ষ্মীটি—বলতে না বলতেই সুধীন দেখতে পেলো কাজলী ছুট দিচ্ছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্র তার গতি। সুধীন শুয়ে শুয়েই দেখতে পেলো কাজলী ছুটছে হরিণীর মত। দৈহিক অনেক পরিবর্তন হলেও কাজলী আজো যে সেই দুষ্টুটী হয়ে আছে তা বেশ বুঝতে পারলো সুধীন ভাবলো আকাশ বোধ হয় ঘোলাটে হবে না। এমন রোদ্দুর ঝলোমলই করবে।

কাজলী চা এনে দিয়ে বসলো। জিজ্ঞেস করলো, মশাইয়ের খবর দিয়ে আসা হয় নি কেন?

সুধীন জবাব দিল, কি লাভ হতো তাতে? শুধু অকারণ ব্যস্ততা আর অনর্থক উৎসাহ ব্যয় করতিস, যার কোনো মানে হয় না।

—মানে তবে কিসের হয় শুনি?—কাজলী ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলো।

সুধীন কাজলীর ঝুঁকে-পড়া মুখের দিকে চেয়ে কৌতুক বোধ করলো।

বল্লে, মানে হয় তোর মুখের কথার। অনেক মানে বার করতে পারি তার। সত্যি, তোকে কি ভালোই না দেখতে হয়েছে কাজল !

কাজলীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। সেটা রাগ না অনুরাগ বোঝা গেল না প্রথমে। একটু পরে বুঝতে পারলো সে রাগই করেছে। ঝাঁঝের সংগে সে বললো, আমায় ভালো দেখতে হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তোমার কাছ থেকে আলোচনা শুনতে চাই না। আমি এখন চল্লুম, যথাসময়ে খেতে যেও।

পকেটে গোটা কুড়িক টাকা রয়েছে। পরাগের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া টাকার অবশেষ। ওটা সে ধার হিসেবেই নিয়েছে, পরে শুধে দেবে আশা করে। কিন্তু এখন কি করবে সে ?

মুক্তির আস্বাদটা কি ভালো ! ভবিষ্যতের সমস্ত ভাবনা লোপ পাইয়ে দেয়। আজকের আলোভরা ঝলোমল দিন খুশিতে উপচে পড়ছে। আর কাজলী এসে তাকে দিয়ে গেছে স্বপ্নের স্পর্শ।

একটু পরেই সে গ্রামের সকলের সাথে দেখা করতে বেরুলো। পথে দেখা হলো নিকুঞ্জ বাবুর সংগে। অগাধ টাকার মালিক ভদ্রলোক। দিব্যি চাঁচাছোলা আলুভাতে চেহারা। তিন বছর আগে সুধীন তাকে যেমনটি দেখেছিল, এখন তার চেয়ে আরেকটু স্থূল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

সুধীনকে দেখে নিকুঞ্জবাবু চমকে উঠলেন।—আরে সুধীন যে ! সরকার ছাড়লো অবশেষে, এঁ্যা !

হঁ্যা, কেমন আছেন আপনি ? সুধীন জিজ্ঞাসা করলো।

—আছি কেমন ? নিকুঞ্জবাবু হেসে উঠলেন অকারণে। হাসি থামিয়ে বল্লেন, লড়াই দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর—ত্রয়োস্পর্শ। এই তিনের স্পর্শ কাটিয়ে বেঁচে থাকাটা কি কম কষ্টকর হে ?

সুধীনের ভালো লাগলো না নিকুঞ্জবাবুর কথা। নিকুঞ্জবাবু অর্থবান লোক,

লড়াই ছুভিক্ষ মন্বন্তরের স্পর্শ লাগে নাকি তার গায়ে ? অগাধ টাকার মালিব তার আবার কষ্ট !

নিকুঞ্জবাবু বলতে লাগলেন, আসল ছুর্ভিক্ষ তুমি তো চোখে দেখলে না একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার ঘটে গেল চোখের সমুখ দিয়ে। লোকে ব ব্যাপারীদের কারসাজিতে ওটা হলো—

স্থধীন বলতে গেল, খবরের কাগজ থেকে—

বাধা দিয়ে নিকুঞ্জবাবু বল্লেন, খবরের কাগজে কট্যুকু লেখে হে ? সেন্সরে কল্যাণে তিন ভাগ ছুধ বাদ দিয়ে এক ভাগ জলের খবরটাই থাকে ওতে। আস ব্যাপার হলো চুপি চুপি শোনো।—নিকুঞ্জবাবু স্থধীনের কানের কাছে মুখ নি গিয়ে বলতে লাগলেন, ছুভিক্ষ ওদের তৈরী—মানে গভর্ণমেণ্টের টাকার দরকা তো। তাই ধান চাল আটকে ছুভিক্ষ সৃষ্টি করে ব্যাপারীদের কাছ থেকে মো টাকা—বুঝতেই তো পারছো। আমি আবার একটা মিলিটারী কণ্ট্রা নিয়েছিলাম।

কিসের কণ্ট্রাক্ট ? স্থধীন জিজ্ঞাসা করলো।

—নেটের, দড়ির জালের। বাছাধনেরা লড়ুই করবেন, তাই 'কামুফ্লে নেট' দরকার। কি করি বলো, ছুর্ভিক্ষে গোটা দেশটা মেরে রেখে গেছে জিনিষপত্রের আগুন দাম। একটা উপরি আয় না হলে চলে না। কি সর্বনে লড়াই হয়ে গেল বলো তো ?

—লড়াই না থামলে আপনারই তো ভালো হতো, দিব্যি মিলিটারী কণ্ট্রা চালিয়ে যেতেন, বেশ তো !

স্থধীনের কথার বিদ্রুপাত্মক ভংগী শুনে নিকুঞ্জবাবু বল্লেন, তুমি ঠাট্টা করছো আমি চল্লুম।

বলে হন্ হন্ করে চলে গেলেন। কৌতুক বোধ করে হাসার উপক্রম কর স্থধীন, ঠিক এই সময় ফিরে এলেন তিনি। আকস্মিক ফেটে পড়ার মত বল্লেন

ঠাট্টা বুঝি না ভাবছো? মিলিটারী কন্ট্রাক্ট নিলেও আমার দেশপ্রেম তোমার চাইতে কিছু কম নয়। জেলে না গিয়েও দেশ-সেবা করা যায় বুঝলে?

নিকুঞ্জবাবু হন্ হন্ করে চলে গেলেন। যাবার সময় হাসিয়ে দিয়ে গেলেন স্বধীনকে। কিন্তু হাসতে গিয়ে স্বধীন পারলো না হাসতে, হাসিটা যেন চেপে গেল।

দুপুরে স্বধীন কাজলীদের বাড়ীতে খেতে গেল। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ মন্দীভূত হওয়ার সংগে সংগে চালের ঈষৎ স্বরাহা হলে হিরণ্ময়ী চলে আসেন ভিটেতে।

স্বধীন খেতে বসলে ঠাকুমা বল্লেন, তা হ্যাঁরে, এত রোগা হয়ে গেছিস যে চেনা যায় না। পাঁজরাগুলো যে সব গোনা যাচ্ছে।

স্বধীন বল্লে, কি করবো বলুন না ঠাকুমা। মোটা হবার কত চেষ্টা করলুম, তা ব্যাটারা কিছুতেই মোটা হতে দিল না। বল্লে, তুমি যদি খুব রোগা হয়ে যাও তো তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।

কাজলী ওর কথা শুনে খিল খিল করে হেসে ফেল্ল। ঠাকুমা বল্লেন, তাই বুঝি ভালো ছেলের মত রোগা হয়ে গেলি!

—ছাড়া আমায় পেতেই হবে। আপনাদের মায়া কি কম! স্বধীন বলতে লাগলো, মাকে হারিয়েছি জেলে যাওয়ার সময়। মাসীমাদেরও দেখলাম। এখন ভরসা আপনারা—

ঠাকুমা বল্লেন, তোর মা ছিল সত্যিকারের লক্ষ্মী। বড্ড ভালোবাসতো কাজলীকে। তুই চলে গেলে কাজলীই থাকতো তার কাছে। কাজলীর কোলেই মাথা রেখে—

চোখ সজল হয়ে উঠলো হিরণ্ময়ীর। কাজলী এসে হাওয়া করতে লাগলো স্বধীনকে। স্বধীন দেখলো কাজলীর আধময়লা শাড়ীর দু তিন জায়গায় সেলাই

দেওয়া। কাজলী ছেঁড়া শাড়ী পরে এসেছে দেখে সুধীনের মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি এলো। তার মনে হলো ছেঁড়া সেলাই-করা কাপড় পরলে কাজলীকে চেনা যায় না। যেন তার অনেকখানিই অনুচ্চারিত থেকে যায়।

খাওয়ার পরে সে চলে এলো। বিকেলের দিকে মহকুমা শহরের কংগ্রেস কমিটির অফিসের দিকে যাবে ভাবলো। কে কে ছাড়া পেয়েছে দেখতে হবে।

কাজলী এলো একটু পরে। সুধীন জিজ্ঞাসা করলো, তোর শাড়ী ছিঁড়ে গেছে নারে ?

কাজলী জবাব দিল, ছিঁড়ে গেলে পাচ্ছি কোথায় ? এনে দাও না দিকি একটা। আজকাল কাপড় বলে পাওয়া যায় না।

বস্ত্রাভাবের কথা সুধীন কিছু কিছু জেনেছিল জেলে থাকতে। তবে সে কিছুই নয়। আজ সে খানিকটা উপলব্ধি করতে পারলো। জিজ্ঞাসা করলো, সত্যি ?

—সত্যি নাতো কি ? কাপড়ের এখন অনেক দাম। সাধারণ লোকে পাচ্ছে নাকি কেউ ? শুধু বড়লোক যারা তারাই জোগাড় করছে।

—এমন অবস্থা কতদিন ধরে ?

—দুমাস হোতে চল্ল এরকম বাড়াবাড়ি। দোকানে নাকি কাপড় নেই। আসল কথা ওরা বেশী দামে লুকিয়ে বিক্রি করছে।

শহর ওখান থেকে মাইল পাঁচেকের পথ। মিলিটারীর কল্যাণে এই তিন-বছরের মধ্যেই বেশ পাকা রাস্তা হয়েছে। চওড়া পিচঢালা রাস্তা। সুধীন হাঁটতে হাঁটতে চল্ল। হাঁটতে তার ভালো লাগে। হাঁটায় কোনো কষ্ট নেই। বেশ হুস্ হুস্ করে হাওয়া এসে লাগে গায়ে।

প্রথমেই সে গেল তার ব্যবসায়ী-বন্ধু শংকরের কাছে। কাপড়ের ব্যবসা করে শংকর। ওর কাছে গেলে সুরাহা হতে পারে। শংকর এক গাল হেসে অভ্যর্থনা করলো, কবে ছাড়া পেলি ?

বাল্যবন্ধু। একসংগে কোলকাতায় ইস্কুলে পড়েছে দুজনে। সুধীন জবাব দিল, পরশু!

—খবর কি বল্। খুব চেহারা ফিরিয়েছিস দেখছি।

—কি খবর চাস? খবর তো তোদের কাছে। ব্যবসা কেমন চল্ছে?

শংকর জবাব দিল, ভালো নয়। একদম বন্ধ বল্লেই হয়। মাল পাই না, মহাজন বাঁধা দামে মাল ছাড়ে না। চড়া দাম দিয়ে নিতে পারলে পাওয়া যায়। আবার বেশী দামে বিক্রী করতে গেলে পুলিশের হ্যাংগামা আছে। খদ্দেরও চটে। তারা বোঝে না আমাদের অসুবিধাটা। ব্যবসা একরকম বন্ধ।

—তাইতো, সুধীন চিন্তিত মুখে বল্লে, তোর কাছে কিছু কাপড়ের আশায় এসেছিলাম।

—কিছু নেই ঘরে। কি দরকার তোর? ধুতি?

—উপস্থিত শাড়ী পেলে বাধিত হতাম। শংকরের কৌতূহলী দৃষ্টির জবাব দিল সুধীন, আমাদের পাশের বাড়ী। চোখে দেখা যায় না ভাই। মার শেষ সময়ে অনেক করেছিল।

শংকর উদাসীন কণ্ঠে বল্লে, এক জোড়া শাড়ী অবশেষ আছে। নিয়ে যা তুই।

অতি সাধারণ শাদা শাড়ী। শংকর দাম নিল বারো টাকা। ওই দামেই নাকি ওর কেনা। শংকর জানালো দুদিন পরে ওই কাপড় জোড়াই নাকি উঠবে কুড়ি-বাইশ টাকায়।

জলযোগ না করিয়ে ওকে ছাড়লো না শংকর। এক সময় সে জিজ্ঞাসা করলো, তোর মনে আছে আমাদের সংগে পড়তো অপূর্ব—ইস্কুলে একবার সেকেণ্ড মাষ্টারের হাতের বেত ভাঙতে গিয়ে তাঁর হাতখানাই ভেঙে দিয়েছিল—?

সুধীন বল্লে, হ্যাঁ, বেশ মনে আছে। কেন?

—তাকে দেখলে আজ চেনা যায় না, এমনি পরিবর্তন হয়েছে তার। আগে

সে খেতে পেতো না, এখন তার অর্ধেক রাজত্ব ও একটী রাজকন্যে বউ। পলাশবনীতে হঠাৎ একদিন আমার সংগে দেখা, অপূর্ব সেখানে মস্ত চালের আড়ত খুলেছে। আকালের দিনে হোর্ড করে দেদার টাকা লুটেছে, এখন সে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের এজেণ্ট।

ও! নিস্পৃহের মত শুনে গেল সুধীন। কে টাকা করলো না করলো সে বিষয়ে তার কোনো উৎসাহ-ই নেই।

শংকরই বকে যেতে লাগলো, শুধু তাই নয়, মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট করে অপূর্ব লাখোপতি হয়ে উঠেছে। প্রকাণ্ড এক গাড়ী কিনেছে। বউটা নাকি অসুস্থ রুগ্ন, তাই নদীর ধারে একটা বাংলো তৈরী করে অপূর্ব আজ বছর খানেক হলো সস্ত্রীক এসে রয়েছে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। রীতিমত পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এলো সুধীন। আসার সময়টাতে সে ক্লান্তি বোধ করেছে। দেয়াল-ল্যাম্পের কাচ ঝকমক করছে। কাজলী ওটা পরিষ্কার করে দুষ্প্রাপ্য তেল ভরে রেখেছে।

আলোটা জ্বালালো সুধীন। একটু পরেই এলো কাজলী তুলসীতলায় সন্ধ্যার আলো দিতে। সুধীন বল্লে, তোর সৌভাগ্য কাজলী একখানা নয় এক জোড়া শাড়ী পেয়েছি।

—এনেছ, কাজলী উল্লসিত হয়ে ছুটে এলো। টুলের উপর সন্ধ্যাদীপ নামিয়ে রেখে কাপড় জোড়াটা নিয়ে সাগ্রহে দেখতে দেখতে বল্ল, বাঁচলুম! তুমি যে কি সুধীদা—

—শুধু মানুষ। কিন্তু কাপড়ের ব্যাপার-অতি শোচনীয় দেখে এলাম, সুধীন বল্লে, অতি কষ্টে জোগাড় করেছি, পরে হয়তো আর পাওয়া যাবে না।

তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখাতে যাচ্ছিল কাজলী। সুধীন বল্লে, একটু দাঁড়া কাজলী। কাজলীর ঠিক পাশটীতে গিয়ে সুধীন জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা কাজল,

বল তো তোর জন্যে আজ অতটা পথ গিয়ে অতি কষ্টে শাড়ী নিয়ে এলাম, আমার লাভটা কি হলো—

সুধীনের প্রশ্ন শুনে কাজলী ফিরে দাঁড়ালো; হাতের প্রদীপটা তার ঠিক সুধীনের মুখের সম্মুখে রইলো। প্রদীপের আলোয় কাজলী দেখতে পেলো তার সমস্ত মুখে কি ক্লান্তি, কি অবসন্নতা। ওই শুকনো বিষণ্ণ মুখখানি যেন বলতে চাইছে: পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, যে এই মুখের পানে তাকায়, দুটো মিষ্টি কথা বলে।

অকস্মাৎ একটা সংকোচ এসে গ্রাস করলো কাজলীকে। সুধীনের গাঢ় উৎসুক দৃষ্টির সামনে তার মাথা নত হয়ে এলো। তবু সে কয়েক মিনিট পরে সমস্ত লজ্জা জড়িমা বিসর্জন দিয়ে বল্ল, লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন জড়াচ্ছ সুধীদা? কষ্ট কি তোমার পুরস্কার হয়ে বাজছে না?

কাজলীর উত্তর শুনে সুধীন কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর আপন মনেই হো-হো করে হেসে উঠলো। কাজলীর প্রদীপ দেখিয়ে চলে যাবার সময় সুধীন সহসা তার চুলের বেণীতে ঈষৎ একটা টান মেরে তাকে চটিয়ে দেবার প্রয়াস পেলো। আচমকা চুলে টান পড়তেই কাজলী কৃত্রিম বিরক্তি দেখিয়ে যাবার সময় সুধীনের পানে চেয়ে বলে গেল: দুষ্টু!

টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় সুধীন—দিশাহারার মত। কি একটা আভ্যন্তরিক অস্থিরতা তাকে ইঞ্জিনের মত ছুট করিয়ে বেড়ায়। স্থির হয়ে কোথাও বসে থাকতে পারে না সুধীন।

রাত্রে ঘুম আসে না চোখে। নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবে না। কিন্তু সে ভাবে কি দেখতে সে ফিরে এলো। দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর সে নিজের চোখে দেখে নি। কিন্তু এই দুদিনেই সে দেখেছে তার পদচিহ্ন।

দুপুরে আসছিল হাড়ি-পাড়ার পাশ দিয়ে। উত্তেজিত জনতার কোলাহল তার চলার গতি রোধ করে দিল। কোথাও যেন কি ঘটেছে এদের। উৎকর্ণ কৌতূহল নিয়ে সুধীন সেখানে গিয়ে দাঁড়তেই সমস্ত কোলাহল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। সুধীন জিজ্ঞাসা করলো, গোলমাল হচ্ছিলো কিসের হে ?

আশে পাশের সমস্ত কুঁড়েগুলি থেকে সবাই এসে জড় হয়েছে ঘটনাস্থলে—স্ত্রীলোক শিশু বৃদ্ধরাও বাদ পড়েনি। সুধীন সম্মুখের বর্ষীয়ান লোকটাকে শুধালো, গণ্ডগোল কিসের দীননাথ ?

থম্‌কে দাঁড়ালো দীননাথ। কাহিনীটা বর্ণনা করার ভার তারই উপর পড়েছে বলে সে যেন একটু ম্রিয়মাণ হলো, যেন একটা ঘৃণা তাকে এই কাহিনী বর্ণন থেকে দূরে রাখতে চাইছিল। তবু সে অদূরে দণ্ডায়মানা নতমুখী একটী মেয়ের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বল্ল, ওই হতভাগী মেয়েটাই তো সব গণ্ডগোলের কারণ বাবু। এই একটু আগে দিন্‌-দুপুরে পাড়ার মধ্যি দিয়ে ওই মেয়েটা একটা গোরা-লোক এনে ঘরে ঢুকিয়েছিল। সবাই আমরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

অতগুলি লোকের সম্মুখে অপমানে লজ্জায় মেয়েটা মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল। সুধীন তার দিকে চেয়ে দেখলো। হাড়িদের ঘরের মেয়েদের মত তাকে দেখতে নয় মোটেই—রংটাও তার কালো নয়। ঈষৎ ধূসরতা-মেশা ফর্সা রং অর্থাৎ গংগাজলের মত। বয়স তার কুড়ি-একুশ হবে। অপরূপ স্বাস্থ্য-সুষমা তার দেহে স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করেছে। শিল্পীর দুর্লভ সৃষ্টি তার সর্বদেহে। পিঠের উপর তার একরাশ ঘন কৃষ্ণ চুল ভেঙে রয়েছে।

দীননাথ বল্লে, শুধু আজ নয়, আমরা জানি রোজ অনেক রাতে গোরা-সৈন্য এসে রাত কাটিয়ে যায় ওর ঘরে। কি সাহস ছুঁড়িটার, এত লোকের চোকের সুমুখে—

একটা শান্তশ্রী তার সর্ব-অবয়বে পরিব্যাপ্ত। যেন মন্দাকিনীর তরংগধারা

স্নিগ্ধ প্রাণোচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে কূলে কূলে। তার মধ্যে নেই ভ্রষ্টা নারীর দুর্দম গতিবেগ, নেই দুঃসহ প্রাণের জ্বালাময় বিকাশ। দীননাথের অভিযোগের জবাবে প্রতিবাদ জানাবার কোনো প্রচেষ্টাই সে করলো না। প্রস্তর-মূর্তির মত যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি রইলো দাঁড়িয়ে।

সুধীন জিজ্ঞাসা করলো, কে আছে ওর ?

কে থাকবে বাবু ? ওর স্বামীটা সেই আকালের সময় ওকে ফেলে চলে যায়, আর ফেরে নি। ছুঁড়িটাও দিনকতক শহরের দিকে গেছ্‌লো, তারপর ফিরে এসে একা এই রকম করে বেড়াচ্ছে। রতন মোড়লের ছেলেটা ওকে বিয়ে করার জন্য হায়রান হয়ে ঘুরলো, ছুঁড়িটা ওপথে পাও বাড়ালো না।

দীননাথের শেষ কথার সময় মেয়েটী একবার চকিতের জন্য তাকালো সুধীনের দিকে। করুণ ব্যথাহত একটী দৃষ্টি সুধীনের সমস্ত অন্তরে বেদনার প্রলেপ দিয়ে গেল। সুধীন বল্লে, কি ব্যবস্থা তাহলে করবে দীননাথ ?

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠলো, তাড়িয়ে দেবো—

দীননাথ বল্লে, ঠিক হবে না সেটা—

রতন মোড়ল অবাক হয়ে বল্ল, তার মানে ? দরদ দেখাচ্ছ নাকি দীন্‌দা ?

—দরদ ? হুঁম্‌! অবজ্ঞাভরে হাসলো বৃদ্ধ দীননাথ, দরদ নয় রতন দাদা, অবশ্য দেখাতে হলে ওটা তোমারই দেখানো উচিত। তোমরাই না একদিন মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে যাবার হন্যে হয়ে উঠেছিলে। বলছিলাম, জোর করে আমরা মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেবো।

দীননাথের প্রস্তাবে সুধীন বিস্মিত হলো, আনন্দিতও হলো, বল্লে, দীননাথ ভালো কথাই বলেছে। তোমরা সবাই মিলে ওর একটা বিয়েই দিয়ে দাও সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে।

আক্রোশটা রতনেরই বেশী। মেয়েটাকে পুত্রবধূ করে নেবার ইচ্ছা তার ছিল একদিন। স্বাস্থ্য ও সুন্দরতাময় এমনি ধারা বউ ঘরে আনা লোভনীয়ই

কিন্তু এখন আর হয় না, ছেলের অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়েছে রতন মণ্ডল। বউটা মোটে ভালো হয়নি। পাটকাঠির মত যেমন চেহারা, তেমনি আবলুশের মত গায়ের রং। বছর পেরুতে না পেরুতেই মেয়েটা এরি মধ্যে বিয়োতে আরম্ভ করেছে।

রতন ঘৃণায় মাটিতে থুথু ফেলে বল্লে, কে বিয়ে করবে ও ছুঁড়িকে? ওর রক্ত আজও রাঙা আছে কি না কে জানে?

রতনের তীব্র ইংগিতে মেয়েটা একবার মুখ তুলে তার দিকে চাইলো। থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো সে একবার, তারপর দীননাথের পায়ের গোড়ায় পড়ে আকুলভাবে মাথা কুটতে লাগলো। অকস্মাৎ এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না দীননাথ। প্রথমটা সে হতভম্ব হয়ে গেল, বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দেবার বৃথা প্রচেষ্টা করতে করতে দীননাথ বল্লে, যা-যা এখান থেকে। মরতে পারিস না, তোর মরণ ভালো। মর্ তুই।

মাটিতে ভয়ানক মাথা ঠুকতে ঠুকতে মেয়েটা বলতে লাগলো, তুমি আমার গলা চিপ্যে মেরে ফ্যালো গো দীন্ কাকা, বাঁচতে আমি চাই না। বাঁচতে আমার এৎটুকুও সাধ নাই গো—

স্বধীন আর দাঁড়ালো না। মাথা ঘুরছে তার। কয়েকদিন থেকে ওই একটা উপসর্গ এসে জুটেছে। মেয়েটার ক্রন্দনোচ্ছ্বাস ও মাথা কোটা তাকে দুর্বল করে তুলছে। আর বেশীক্ষণ থাকলে সে পড়ে যাবে। এই কোলাহল-বিবাদ-তিক্ততা তার সর্বাংগে বিস্ফোটকের জ্বালা ধরিয়ে দেয়, মনুষ্যত্বের এই হেয় দীনতা তার মনোজগতের সুনীল আকাশকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়। সহ্য করবার শক্তি তার নেই, সমস্ত সহনশীলতা তার লোপ পেয়েছে।

একি হলো তার?

পরদিন অনিচ্ছাসত্বেও স্বধীন সেখানে গেল। যেতেই শুনলো মেয়েটা গত

াত্রেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এদের বিয়ের ষড়যন্ত্র সে পলায়ন করে. ্যর্থ করেছে।

সুধীনের দিকে চেয়ে হাসছিল রতন মোড়ল। দীননাথকে বিদ্রূপ করবার ৳দ্দেশ্যে। বিরক্ত হয়ে বল্লে দীননাথ, তুমি আর হেসো না মোড়ল, হাসি শোভা পায় না।

দীননাথের কথার উত্তরে রতন একটা কড়া জবাব ছাড়তে যাচ্ছিল, সুধীন াকে থামিয়ে দিল। বল্লে, ঝগড়াটা একটু থামাও তোমরা। কি অবস্থা হয়েছে দেখেছো একবার—

দীননাথ লাফিয়ে উঠে বল্লে, বলেন তো বাবু একবার ওই কথাটা। কমাস রে কথাটা ভেবে আসছি আমি। মুখ ফুটে বলতে পারি না কাকেও। কাকে লবো? একটা মেয়েকে ধরে লোক দেখানো বিচার করলে কি হবে— বারই তো ওই গলদ। বুকে হাত দিয়ে রোদ্দুরে মুখ করে দাঁড়াবার সাহস আজ আর কারোর নেই বাবু, কেউ আর মানুষ নয়।

বৃদ্ধ দীননাথ। মৃত্যু-পথ-যাত্রী। চুল তার শাদা হয়ে এসেছে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে, তবু এদের মধ্যে একমাত্র এই লোকটাই রূঢ় বাস্তবকে উপলব্ধি করেছে। চোখ কান বুজে সত্য অস্বীকার করার কোনো প্রয়াস তার নেই। কেউ আর মানুষ নয় আজ। মনুষ্যত্ব লোপ পেয়েছে সবার। শুধু মেয়েটাকে ধরে সাজা দিয়ে পরোক্ষে নিজেদের সাধুতা প্রমাণ করবার চেষ্টা নিরর্থক, তাতে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না—বৃদ্ধ দীননাথ একথাটাই স্পষ্ট করে প্রচার করে দিল। কার ঘরে ঢোকে নি সৈন্য! নগদ কড়কড়ে রুপোর লোভ কে সামলাতে পেরেছে? আকালের দিনে ক্ষুধার গ্রাস সংগ্রহের জন্য কে তাদের বউ-ঝিদের রাতের অন্ধকারে সংগোপনে গোরাদের সংগে বাগানে পাঠিয়ে দেয় নি?

সবাই জানে সেকথা। সুধীনেরও তা অজানা নয়। যে মেয়েগুলোর

স্বামীরা আজো ফেরেনি, তারা প্রায় প্রকাশ্যেই দেহকে পণ্য করে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করে নিয়েছে। শুধু তারা কেন, সমস্ত নিম্ন সমাজ আজ তাদের এই পথই বেছে নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে শাল-মহুয়া-বনস্পতির ঘুটঘুটে স্তব্ধতায় সৈন্যরা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের প্রতীক্ষায়। আর অন্ধকারে গা মিলিয়ে সুযোগ বুঝে মেয়েগুলো ওদের ডেকে এনে ঘরে তোলে। মন্দ হয় না রোজগার।

রাত্রির কলংকিত প্রহরে সমস্ত গ্রাম এই সব সৈন্যদের পদধ্বনি গোণে। আকাশের দূর তারা, জাগ্রত পেচকেরা এই নিশীথ অভিসার অবলোকন করে ধিক্কারে স্তব্ধ হয়। মৃত্যুর আশংকা আজ নেই, চলে গেছে আকাল, মানুষ বুঝেছে জীবনের কি গরিষ্ঠ মূল্য। উপবাস নয়—উপবাস মূর্খতা, পাপ-পুণ্যের বিচার নয়—ওটা জীবন-ধারণের পক্ষে অবান্তর, আজ অভিসার, আজ দেহ-দানের সুরম্য উৎসব।

সকালে দিনের আলোয় সব সহজ। গত রাত্রির কাহিনীটা শুধু স্বপ্ন হয়ে থাকে। একটা লজ্জাজাগানো উগ্র স্বপ্ন। দিনের আলোয় সহজ জীবনের আনাগোনা। পূর্বরাত্রির স্বাক্ষরটা তখন লজ্জা দেয়। ছিঃ!

মাথার ওপরের রৌদ্রের প্রখরতায় সাধুত্বের মুখোশ রক্ষার প্রয়াসটা স্বাভাবিক কারণেই স্বভাবগত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দীননাথ জানে নিশীথ রাত্রে লোক-লোচনের অন্তরালে সমাজ-জীবনে মানুষ নিজের হাতে বয়ে আনলো যে ক্লেদ, তা ধুয়ে মুছে যাবার নয়। রক্তের মূল্য দিয়ে যে ইতিহাস কেনা হয়, তার পরিসমাপ্তি হয় রক্তের আঁখরে।

চরম মূল্য আদায় করছে মন্বন্তর। এমনি করে ধ্বংসের পথে চলেছে সমাজ।

ক'দিন ধরে সুধীন লক্ষ্য করছে ওদের মেয়েগুলোর চেহারারও পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন সুন্দর বৈরাগীর বাড়ীর বউটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে জল নিয়ে

আসছিল। আগে তো খোঁড়াতো না সে। এখনই বা খোঁড়ায় কেন? চার' পাঁচটা মেয়ে সুধীনের নজরে পড়েছে: তাদের নাক বসে গেছে, চুল উঠে গেছে। গায়ে-হাতে পারার দাগ। যৌন রোগটা ওদের প্রতি পরিবারেই ছড়িয়ে পড়ছে। দুমুঠো খাদ্যের জন্য বেঁচে থাকার জন্য মেয়েগুলো যাদের কাছে গিয়েছিল ওটা তারাই করুণা করে উপহার দিয়েছে।

হিরু পাঁজার ভালোমানুষ-মত বউটা একটা লাল সন্তান প্রসব করেছে—টুকটুকে লাল। ছেলেটাকে নিয়ে ওরা কত আদর করছিল। অনেকদিন পরে নিঃসন্তান হিরুর বংশধর এসেছে।

হরিশ চক্রবর্তী—পলাশবনী প্রাইমারী ইস্কুলের মাষ্টার—দেখা হলো তার সাথে। আগষ্ট দিনের আন্দোলনে বিশেষ কিছুই করে নি, তাই ধরা পড়ে নি। দুর্ভিক্ষের সময় সে প্রশংসাজনক কাজ করেছিল। দু-দুটো লংগরখানা চালিয়েছিল। এখন কাপড়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে।

হরিশ চক্রবর্তী বল্লে, কাল সকালে একটা মিছিল বার করবো ভাবছি—নগ্ন মানুষের মিছিল। কাপড় চাই। এস-ডি-ওকে যে কোনো প্রকারে মুভ্ করতে হবে। আসবে তো?

সুধীন সম্মতি জানালো।

ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল পাঁচু কামারের সংগে। নমস্কার করে পাঁচু বল্লে, আপনারই কাছে যাচ্ছিলাম বাবু।

—কেন?

পাঁচু বল্লে, একটা দুটো কাপড় না হলে আর চল্‌ছে না বাবু। এক এক করে সব শেষ হয়ে গেছে, এখন পরণেরগুলোই সম্বল। টুসির মা আমাকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না বাবু। এমনি তো পাওয়া যায় না, তাই বলছিলাম ম্যাজিষ্টর সাহেবকে একটা আর্জি লিখে দিলে হয়।

—ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখলেই হবে কিনা কে জানে। তার চেয়ে কাল সকালে

হরিশ মাষ্টারের মিছিলে যেও তুমি। সুরাহা হলেও হতে পারে।

—আর পারি না বাবু। পায়খানার ছেঁড়া চট নিয়ে টানাটানি করছে ওরা। আমি বাড়ী গেলেই টুসির মা তুল্‌কালাম বাধাবে। পারি না আর, মরণ হোক আমার!

এই নিরাশা ও মরণের বন্দনা দিকে দিকে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ছে। জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মৃত্যু। জীবনের জয়গান মানুষ ভুলে গেছে। সুধীন ভেবেছিল, দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে পুরোনো পৃথিবীর শেষ হয়েছে। নোতুন ফসলে এবার নোতুন জীবনের নবান্ন হবে। আলোয় রোদ্দুরে ভরা হাসিখুশি কবোষ্ণ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল সে।

কোথায় গেল তা?

সকালে উঠেই শুনলো পাঁচুর দজ্জাল বউটা আত্মহত্যা করেছে। পরণের একমাত্র ছেঁড়া কাপড় কড়িকাঠে টাঙিয়ে শ্বাসরোধ করে সে মরেছে। কাপড়ের জন্যে রাত্রে নাকি ফের একচোট খুব ঝগড়া হয়েছিল। নিরুপায় পাঁচু অধীর ও দুঃসাহসী হয়ে দজ্জাল বউটাকে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দেয়। ব্যস, সকালে দেখা গেল: ঢেকি ঘরের পাশে দালানে কড়িকাঠে ঝুলছে ক্ষ্যান্তমণি। পরণের কাপড় খুলে কড়িকাঠ ঝুলিয়ে দিয়েছে ক্ষ্যান্ত। কাপড়টা পাক খেয়ে কেটে বসে গেছে গলায়। সম্পূর্ণ উলংগ সে—জিভ বেরিয়ে এসেছে, চোখ ঠেলে বেরুচ্ছে কোটর থেকে। একটা পৈশাচিক আক্ষেপের চিহ্ন তার সারা দেহে। মুখে উল্লসিত প্রতিশোধের বিভৎস ভংগীমা।

হরিশ চক্রবর্তীর মিছিলে যাবার জন্যে সুধীনদের গাঁ থেকেও লোক যাচ্ছে। ভদ্রলোকরা অবশ্য কেউ যাচ্ছে না। যারা লজ্জা-সম্মানের ভয় করে না তারাই যাচ্ছে: চাষা বাগ্‌দি ডোম হাড়ি কৈবর্ত কেওট—স্ত্রীপুরুষ দলে দলে। পরিধেয় জীর্ণ মলিন। মেয়েদের আব্রু নেই। তাতে কি? কাপড় পাওয়া যাবে, এই আশায় তারা যাচ্ছে।

সেই পুরোনো পৃথিবী—১৯৪২ এর আগষ্ট থেকে আজ পর্যন্ত—ভারতবর্ষের কোনো পরিবর্তন হলো না। বৃদ্ধ স্থবির ভারতবর্ষ।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সংগে বসে ছিল অপূর্ব। "ছোটা-হাজারীটা" এইমাত্র একত্র সমাপ্ত হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বল্লেন, আর্দালিটা বলছিল আজ সকালেই নাকি একটা ডিমনষ্ট্রেশন আসবে কাপড়ের জন্যে। খবরটা সে কাল পেয়েছে।

অপূর্ব বল্লে, এলেই হলো। আমি আপনাকে বলছি মিঃ গুপ্ত, ইউ মাষ্ট ডিল ইট উইথ এ রাফ হ্যাণ্ড। কুকুর-বেরালদের রীতিমত কিক্ করতে হয়—প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে।

—রাইটলি। কিন্তু দেখো অপূর্ব, মব আজকাল খেপে আছে, ডেপুটেশন-ডিমনষ্ট্রেশনের সংগে মিষ্টি কথায়—ওই বোধ হয় আসছে ওরা।

Porch এ বসেছিলেন মিঃ গুপ্ত ও অপূর্ব। পাকা সড়ক দিয়ে না এসে সামনের মেঠো পথ দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে মগ্ন মানুষরা মিছিল করে আসছে। মাঝে মাঝে শ্লোগান উঠছে: কাপড় চাই, কাপড় আমাদের দিতেই হবে।

সেদিকে চেয়ে অসহিষ্ণুভাবে মিঃ গুপ্ত বল্লেন, এত লোক এসে জড় হয়েছে! এইসব মিছিল করা একটা ঢং হয়েছে এদের।

বহু মানুষের কোলাহল মিঃ গুপ্তের বাংলোর সম্মুখে এসে থেমে গেল। এইবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সংগে বুঝাপড়া হবে। কাপড় চাই-ই, মানুষের লজ্জা-সম্ভ্রম নইলে থাকবে না।

মিছিল পিছনে রেখে সুধীন একা চলে এলো ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে। মিঃ গুপ্তের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সুধীন বল্ল, কাঁকনতলা সেনহাটি চন্দ্রকোণা পলাশবনী—সমস্ত গ্রামের মানুষ আজ আপনার দিকে তাদের সমস্ত

আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চেয়ে আছে। ওই দেখুন তারা দাঁড়িয়ে আছে। কোনোরকমে লজ্জা রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু নগ্নতা ওতে ঢাকে নি। সমস্ত জেলার ভার আপনার ওপর, আপনাকে এর ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

—কি চান আপনারা? গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ গুপ্ত। এতগুলি লোকের জনতা তাঁকে অনস্বীকার্যভাবে বিচলিত করেছে।

—কাপড় চাই।

মিঃ গুপ্ত বলেন, দরখাস্ত এনেছেন?

সুধীন জবাব দিল, আনি নি, আপনি চান তো লিখে দিতে পারি।

—থাক দরকার নেই।

আর্দালি সাহেবের প্যাড-কলম নিয়ে এলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম?

—সুধীন রায়।

—সুধীন রায়!

গুপ্ত সাহেব একবার তাকালেন তার দিকে। নামটা তাঁর অজানা নয়। এখানকার প্রতিটি পলিটিক্যাল সাসপেক্টদের নাম তাঁর মুখস্থ।

সুধীনের নাম শুনে অপূর্বও একবার তার মুখের পানে চাইলো। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর সে বলে উঠলো, সুধীন রায়। নামটা চেনা লাগছে—

সুধীনও তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বল্লে, তুমি অপূর্ব না?

—হ্যাঁ, সুধীন তুমি! হতবাক অপূর্ব সুধীনের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে পুরে বল্ল, চেনার কোনো চিহ্নই তুমি রাখো নি। কি চেহারাই হয়েছে তোমার! এই সব লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি আজকাল?

গুপ্ত সাহেব বিস্মিত হয়ে অপূর্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুধীন বাবু তোমার পরিচিত নাকি অপূর্ব?

অপূর্ব জবাব দিল, হ্যাঁ। আমি ওর সহপাঠী ছিলাম। এই সুধীন রায়

ছিলো আমাদের ক্লাসের সেরা ছেলে। কিন্তু মিঃ গুপ্ত, সুধীনের আর্জির সুরাহা, আপনাকে করে দিতেই হবে।

হেসে উঠলেন গুপ্ত সাহেব। বল্লেন, চেষ্টার কসুর করবো না এ আশ্বাসটুকু দিতে পারি। ইউ ডোণ্ট ওয়োরি।

ধন্যবাদ দিয়ে চলে আসছিল সুধীন। অপূর্ব ছাড়লো না। বল্লে, চলো আমার বাড়ী। নোতুন বাংলো করেছি দেখবে চলো। এতকাল পরে দেখা হলো, কোনো অজুহাতই তোমার শুনছি না।

বাইরে এসে হরিশ চক্রবর্তী ও মিছিলকে আশ্বাস দিল অপূর্ব, আপনাদের আর্জি হুজুর শুনেছেন। সুরাহা হয়ে যাবে একটা। ভাববেন না।

সুধীনকে একরকম জোর করেই নিয়ে গেল সে।

পথে আসতে আসতে সুধীন শুনলো তার কাহিনী : বিপর্যয় অতিক্রম করে কেমন করে সে ভাগ্য পরিবর্তন করে ফেলেছে। কিন্তু সে সুখী নয়—তার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য। আজ বছর দুই হলো তার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। অপূর্বর বিজ্‌নেসের ক্ষতিও নাকি এজন্য কিছু কিছু হয়েছে। পলাশবনীতে আড়ত খুলেছে অপূর্ব। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর। নদীও আছে এখানে। অপূর্ব তাই স্ত্রীর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে নদীর ধারেই বাংলো তৈরী করে এখানে এসে রয়েছে।

সুবর্ণরেখার শীর্ণ একটা শাখা এদিকে ঘুরে এসেছে। সুধীন তার নাম রেখেছে কাজলরেখা। কাজলরেখার তীরে বেড়াতে সুধীনের কত ভালো লাগে। কাজলরেখার বালুচরে রোদ্দুর পড়ে চিক্ চিক্ করে—মনে হয় সমস্ত চরটা যেন সোনায় তৈরী। অনেকটা বালি পেরিয়ে তবে জল পাওয়া যায়।

বাংলোর বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে পড়লো সুধীন। অপূর্ব বল্লে, বসো আসছি। আমার স্ত্রীর সংগে আলাপ করিয়ে দেবো। তারপর তোমার গল্প সব শোনা যাবে।

ইজি-চেয়ারে শুয়ে সুধীন ভাবছিল এই অপূর্ব! সেদিন শংকরের মুখে শুনেছে তার কথা। যেটুকু শুনেছে তাতেই সে আভাষ পেয়েছে। পথে আসতে আসতে অপূর্ব নিজেও শোনালো তার কাহিনী। দুর্ভিক্ষের দিনে বহু মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যারা ঐশ্বর্যের পুঁজি সঞ্চয় করেছে, কোটি কোটি মানুষের নিঃসহায় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা বিলাস-ব্যসন উপভোগ করছে, অপূর্ব তাদেরই একজন। সুধীনের মন ভরে উঠলো ঘৃণায়। মনুষ্যত্ব সমবেদনা কর্তব্যবোধ এদের নেই। এদের আছে অর্থের আভিজাত্য দম্ভের ইতিবৃত্ত বিলাসের চাকচিক্য আর স্বার্থের স্বাজাত্য।

ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে এলো সুধীনের মন। ভাবলো অপূর্ব এলেই সে চলে যাবে। পরিচয়ের দীর্ঘসূত্রতা শুধু অকারণ নয়, অনাবশ্যকও।

শুনতে পেলো স্ত্রীকে বলতে বলতে আসছে অপূর্ব, পুরোনো বন্ধুকে ধরে এনেছি। তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দেবো বলেছি।

পিছন দিকের দ্বারের পর্দা সরিয়ে প্রথমে এলো অপূর্ব, তার পিছু পিছু এলো যে মেয়েটী, তাকে দেখে সুধীনও যেমন তেমন সুধীনকে দেখে সুবর্ণও—দুজনেই অত্যধিক বিস্ময় ও অসহ্য আবেগে অভিভূত হয়ে উঠলো। কেউ কিছু কথা বলতে পারলো না প্রথমে। অপূর্ব পরিচয় করিয়ে দিতে গেল, আমার বন্ধু সুধীন রায়। আর এ হোলো—

—সুবর্ণ, তোমার স্ত্রী—অপূর্বর পরিচয়দান-পর্ব সমাধা হতে না হতেই সুধীন মৃদু হেসে বল্লে। হাসিটা মৃদু হলেও ক্লান্তিটা সে ঢাকতে পারলো না। অপূর্ব সেদিকে নজর না দিয়ে সুধীনকে জিজ্ঞাসা করলো, সুবর্ণকে তুমি চেনো নাকি?

অপূর্বর প্রশ্নের উত্তরে সুধীন স্তব্ধ-বিস্মিত সুবর্ণর দিকে একবার চেয়ে বল্লে, হ্যাঁ চিনি।

সুবর্ণ বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে তাকিয়েছিল সুধীনের দিকে। সুধীনকে দেখার প্রত্যাশা সে করে নি। তাই অকস্মাৎ সুধীনকে দেখে সে অতিমাত্রায় অবাক

হয়ে উঠেছে। অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করলো, সুধীদা তুমি! এতদিন কোথায় ছিলে তুমি সুধীদা?

সুবর্ণর জিজ্ঞাসায় সুধীনের মুখে ফের ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বল্লে, সরকারের অতিথি হয়ে ছিলাম এদ্দিন।

—জেলে গিয়েছিলে! বেশ ভালো চেহারা ফিরিয়ে এনেছো দেখছি।

সুধীন বল্লে, আমার কথা ছেড়ে দাও, অপূর্বর মুখে তোমার অসুখ শুনলাম।

সুবর্ণর কানে সে কথা ঢুক্‌লো কিনা বোঝা গেল না। সে জিজ্ঞাসা করলো, মা কেমন আছেন?

সুধীন জবাব দিল, জেলে যাবার সময়ই মা মারা যান।

অপূর্ব বিস্মিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে আছে দেখে সুধীন বল্লে, সুবর্ণ একদিন আমার ছাত্রী ছিল।

—তুমি সুবর্ণকে পড়াতে? মাই গড! অপূর্ব ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে সুধীনের হাতটা চেপে ধরে বল্লে, কি আশ্চর্য বলো দেখি, আমরা তিনজনেই তিনজনকে জানি! কিন্তু একথা আমি এতদিন জানিনি কেন?

সুবর্ণ বল্লে, জানবে কি করে? আমিই কি জানতাম সুধীদা তোমার পরিচিত?

অপূর্ব বল্লে, আর আমিও যে জানতুম না সুধীন কাঁকনতলার ছেলে। আমাদের যতটুকু পরিচয় তা কোলকাতার একটা ইস্কুলে পড়বার সময়।

কতদিন পরে দেখা। কত পরিবর্তন সকলের। কৃশতায় ভেঙে পড়ছে সুধীন। পূর্বের আদর্শ-লাঞ্ছিত কপালে আজ তার কত অবসন্নতা ক্লান্তি ছড়ানো। আর সুবর্ণ? সে ভাগ্যবানের গৃহিণী। অনেক বদলে গেছে তার। সমস্ত অবয়বে তার এখন একটা বিলাসের ভংগী এসে গেছে। এই সুবর্ণই একদিন সুধীনের দুঃখ-জীবনের সাথী হতে চেয়েছিল। কিন্তু বোধ হয় সে ঠিকই করেছে। সুধীনের সহকর্মিণী হলে দুঃখের আগুনে সুবর্ণ গলে যেত। সুবর্ণ

ইন্দুমতী নয়, যে ইন্দুমতী একদিন সংশয়ের কালো রাতে একাকী শয্যা 'ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে, যে একদিন অভাব-শূন্যতা-হতাশার ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে সুধীনের হাতে সোনার চুড়ি খুলে দিয়েছিল। সুবর্ণর মত সুখ পায়নি ইন্দুমতী, পায় নি সম্পদ, তবু সে সংগ্রাম করেছে, আক্রমণ করেছে, জীবন-যুদ্ধে তাকে হারাতে পারে নি কেউ।

যদি বেঁচে থাকে, বোধ হয় সে আজো বিজয়িনী।

সুবর্ণ বল্লে, আজ তোমার সব কথা না শুনে ছাড়ছি না কিন্তু।

বিস্ময়ের ভাবটা কেটে যাবার পর সহজ সাবলীল হয়ে উঠেছে সুবর্ণ। একদিন সুধীনের তপস্যা যে প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে চেয়েছিল, আজ তার কাছে সেটা নিতান্ত উপভোগ্য গল্পের সামিল। সুধীন উদাসীন-ভাবে বল্লে, সে তোমার ভালো লাগবে না। পরে শোনাবো একদিন।

অপূর্ব বল্ল, সুধীন যে এখানকার একজন লিডার চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করতাম না। কাপড়ের ব্যাপারটা গুপ্তকে বলে যাহোক একটা কিছু সুবিধা করিয়ে দেবো'খন।

ঠিক এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চাপরাসি এসে অপূর্বকে সেলাম করে একটি ছোট্ট চিঠি দিল। অপূর্ব সেটা পড়ে ওদের দুজনকে বল্ল, গুপ্ত ডেকে পাঠালো। তোমরা বসো, আমি ঘুরে আসি। সুধীনকে আজ না খাইয়ে ছাড়া হবে না কিন্তু।

অপূর্ব চলে গেল।

দুজনে রইলো একা। অপূর্বর গমন-পথের দিকে নির্বাক-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো দুজনে। বোধ হয় এতদিন পরে অকস্মাৎ এই নিবিড় সান্নিধ্য দুজনের মধ্যে একটা অননুপূর্ব সংকোচ সৃষ্টি করেছিল, যেটা অপূর্বর মত তৃতীয় ব্যক্তির

উপস্থিতিতে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। পাশাপাশি দুই চেয়ারে দুজন, মাঝে ছোট্ট টিপয়ের ব্যবধান মাত্র। সম্মুখে বাংলো-কম্পাউণ্ডের বাইরে ছোট্ট রাস্তাটীর পারে নীচে কাজলরেখার ধারা।

অপূর্বর চলে যাবার পর ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে সেই বহুদিনের হারানো পরিবেশ ফিরে এলো। একটু পরেই গাঢ়স্বরে সুবর্ণ বল্ল, তুমি আজ আমায় ক্ষমা করবে কি না জানি না, কিন্তু এও জেনো সুধীন, সেদিন তুমি আমায় একা ফেলে না গেলে আজ তোমার পথে নেমে আসার দুঃসাহসও আমার হতো। যাক সে কথা, আজ বোধ হয় তা অবান্তর।

সুবর্ণর কথা নিঃশব্দে শুনে গেল সুধীন, কিছু বল্লে না। বোধ হয় হজম করে নিল তা। কিন্তু অল্প পরেই দূরের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্ল, হয়তো আজকেরটাই ভালো হয়েছে। নইলে আরো কত দুঃখ আরো কত বেদনা জমে উঠতো চলার পথে। এই ভালো, এই শোভন।

কাজলরেখায় এখনো তেমন ঢল নামে নি। শীর্ণ স্রোতস্বতী অতি মন্থর গতিতে পুষ্টিলাভ করছে। নদীগর্ভের চড়াগুলো এখনো ঢাকে নি। তবে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। আষাঢ়ের শ্যামগম্ভীর মেঘ। বর্ষাগমের পৃথিবী নোতুন বৃষ্টির জন্য আকুল।

সুধীন সহসা বল্ল, মনে আছে সুবর্ণ, সেই একদিন এমন বর্ষার দিনে ময়ূরের মত তুমি আনন্দে আমায় কবিতা শুনিয়েছিলে, কোথায় গেল সে সব দিন ?

বিগত দিনের স্বপ্নে সুবর্ণর চোখে বর্ষামেঘের কাজলরেখা ঘনালো। স্বপ্নলোকের কুহেলিমাখা গাঢ় মাদকতা এলো তার কণ্ঠে, ভারী গলায় সুবর্ণ বল্ল, আজও ইচ্ছা হয় ওই নদীর ধারে বসে প্রাণভরে তোমার গল্প শুনি। গল্প শুনতে শুনতে হয় তো নামবে ঝম ঝম বৃষ্টি, কেঁপে কেঁপে উঠবে নদীর জল, কিন্তু তোমার গল্প থামবে না। চলো না, বালির ওপর গিয়ে বসি।

—থাক আজ, সুধীন বল্লে, অপূর্ব আসুক ফিরে।

. বাস্তবে ফিরে এসেছে সুধীন। স্বুবর্ণ হয়তো হারিয়ে ফেলছে নিজেকে, অতীতের তীব্র দাহ তার সমস্ত বর্তমান-বোধকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। হয় তো সে নিজেকে রাখতে পারবে না, হয় তো কিছু উপায় না পেয়ে স্বুবর্ণ ভেঙে পড়বে একটা হু-হু করা কান্নার উচ্ছ্বাসে—আসল কান্না সেটা নয়, কারণ দুঃখের অন্তর্দাহে রূঢ় বাস্তবের নিখাদ বালুর নীচে ফল্গু-ধারার মত যে কান্না অন্তঃসলিলা, সেটাই আসল খাঁটি কান্না, তাতে হৃদয়াবেগের ভেজাল নেই—হয়তো সে বার বার ক্ষমা চাইবে, হয়তো—

কিন্তু দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চল্‌বে না সুধীনের। তাকে মনে রাখতে হবে স্বুবর্ণ আজ তার পার্শ্বচারিণী নয়, সে আজ তার সচিব নয়। সে আজ বহুদূরে সরে গেছে। দুর্বল মনকে কশাহত অশ্বের মতই সংযত রাখতে হবে।

সুধীন বল্লে, এবার উঠি আমি, অপূর্বর সংগে দেখা হলো না, বলো তাকে—

সুধীনের ব্যস্ততায় স্বুবর্ণ চমকিত হলো। সুধীন চলে যাবে ভাবতেই পারে নি সে। সে বল্লে অবাক হয়ে. তুমি যাবে কেন? তোমার বন্ধু তোমাকে খেয়ে যেতে বলেছে। তোমার কোনো কথাও তো শোনা হলো না—

—শরীরটা আমার মোটেই ভালো নয় স্বুবর্ণ, বেশী strain সহ্য হয় না। সকাল বেলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দরবারে আড়াই মাইল পথ ভেঙে প্রশেসন নিয়ে এসেছি। বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। আজ আমায় বিদায় দাও স্বুবর্ণ—

স্বুবর্ণর আপত্তির প্রত্যাশা না করেই তাকে বিস্মিত করে সুধীন জোর করেই চলে এলো। সেই শারীরিক দুর্বলতাটা এসে তাকে আক্রমণ করেছে। দপ্ দপ করছে মাথাটা। বোধ হয় সে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

এখনো বহু পথ অতিক্রম করতে হবে তাকে।

স্বুবর্ণর সংগে দেখা হলো। ভালোই হলো। স্বুবর্ণ যখন ধীরে-সুস্থে চিন্তা করতে বসবে তখন হয় তো ভাববে: এই ঠিক। এই শোভন। সুধীনের

কংকর-পথে পদে পদে গূঢ় বিপদ ফণা তুলে রয়েছে। ও পথে শুধু ব্যর্থতার গ্লানি, আর কিছু নয়।

হয়তো সে হাসছে সুধীনের মূঢ়তায়। সুধীন কি বোকা, এমনি করে সত্য-সত্যই কি অভিশাপ বরণ করতে হয়? এ পথ-চলা না অপমৃত্যু?-?

সমস্ত বুদ্ধি-বাদ অলংকারের পুঁজির নীচে চাপা পড়ে গেছে।

মাথাটা দপ্ দপ্ করছে। কে যেন লৌহ-মুষ্টিতে সমস্ত মাথাটা চূর্ণ করে দিচ্ছে। সহ্য করতে পারছে না সুধীন। এ কি হলো তার? সহনশীলতাও কি সে হারালো? কতকাল আর কতকাল সে এমনি যন্ত্রণা এমনি ধারা আত্মার অপমৃত্যু সহ্য করবে? তার ছাব্বিশ বছরের জীবনে এই স্থবিরতা কেন?

কাজলী ধমক দিয়ে উঠলো, না বলে কোথায় যাও এমনি করে? ওই দুর্বল শরীরে টো-টো করে ঘুরলে সহ্য হবে?

মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে আসছে সুধীন। উস্‌কো-খুস্‌কো এলোমেলো চুল। দৃষ্টি বিভ্রান্ত অস্পষ্ট। কাজলী তাড়াতাড়ি ছুটে এলো কাছে, কি হয়েছে তোমার? এমন করছো কেন? একি, তোমার যে বড্ড জ্বর হয়েছে!

অসম্ভব উত্তাপে সুধীনের সমস্ত শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। কাজলী তার হাত ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল। চাদরে ঢেকে দিল পা পর্যন্ত। তারপর শিয়রের পাশটিতে বসে নিতান্ত অসহায়ের মত বলে উঠলো, একটা অসুখ বাধিয়ে তবে ছাড়লে! আমি এখন কি করি? যাই ঠাকুমাকে বলি গে—

থাক, সুধীন বারণ করলো, মাথাটা একটু টিপে দে কাজল—

—বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে সুধীদা?

—হ্যাঁ, চোখ বুজে সুধীন বল্ল, তোর হাত কিন্তু খুব মিষ্টি কাজল, সব যন্ত্রণা আমার জল হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি ঘুমোও চুপটী করে।

আঁচল ভিজিয়ে কাজলী সুধীনের জ্বরতপ্ত কপালে শীতলতার স্পর্শ দিতে দিতে বাতাস করতে লাগলো। বহুক্ষণ এইভাবে উৎকণ্ঠার সংগে সুধীনের শুশ্রূষা করে দিতে লাগলো কাজলী। সুধীদার কষ্টে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। মনে মনে সে এই কামনাই করছিল: যদি ঈশ্বর বলে সত্যই কেউ থাকে, সে যেন তার সুধীদার সমস্ত দুঃখ কষ্ট লাঘব করে সব যেন দিয়ে দেয় কাজলীকে। তা বহন করবার শক্তি তার আছে, কিন্তু সুধীদার যে আজ কেউ নেই।

মা যে ওঁরই হাতে সুধীদার ভার দিয়ে গেছেন!

কতক্ষণ পরে সুধীনের তন্দ্রা ভেঙে যেতেই সহসা সে দেখলো সেবারতা কাজলী ক্লান্ত হয়ে তারই বালিশের একটী কোণে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতে তার তখনো সেই পাখাটি। কাজলীর চুল সুধীনের গলার কাছে লুটিয়ে রয়েছে—মালার মত।

মাথাটা হাল্‌কা লাগছে। পরিষ্কার হয়ে গেছে সমস্ত ভার। জ্বরের উত্তাপও অন্তর্হিত। অতি দুর্বল শরীরে দীর্ঘপথ পর্যটনের ক্লান্তি ও বহুদিনের সঞ্চিত সুষুপ্ত মনোবেদনা আকস্মিক প্রবাহে জ্বর হয়ে ফুটে উঠেছিল। কাজলীর মমতা ভরা সুস্নিগ্ধ শুশ্রূষায় সমস্ত গ্লানির অবসান হয়েছে।

বালিশের এক পাশে কাজলী তার স্থান করে নিয়েছে। সে হয়তো বুঝেছে এই তার স্থান, স্থায়ী স্থান। সুধীনের মনে হলো তার নিঃসংগ জীবনের দূর যাত্রায় সে আর সংগীহীন নয়, সে আজ পেয়েছে সাথী, এক পরম নির্ভরশীল জীবনের সাথী, ভাবীকালের বন্ধুর উপত্যকায় যে তার সহজ অগ্রগমনের ইতিহাস রচনা করে দেবে।

বোধ হয় এক পশলা বর্ষণ হয়ে গেল। মেঘ কেটে গেছে। ঝলমল করছে আকাশ। বিহংগেরা আবার বন্দর খুঁজতে বেরিয়েছে। নদীতে ঢল নামছে। প্রাণের প্রবাহে কাজলরেখা বয়ে চলেছে জীবনের নব নব ছন্দে দুর্বার আনন্দে।

পত্রপল্লবেরা কানাকানি করছে জমানো বৃষ্টির ফোঁটায়। নবাংকুরে স্পন্দন জাগছে।

ধরিত্রীর কোলাহল সশব্দে মুখর হয়ে উঠেছে। মাটিকে চিনেছে মানুষ। নাই বা থাকলো আজ স্বর্ণের আভিজাত্য রৌপ্যের ঝংকার। মাটির মানুষের কাছে আজ মাটির দামই বেশী। হে জন্মভূমি, প্রণাম!

স্বর্গজয়ের সংগ্রাম আজো থামে নি। স্বর্গ আজ দূরে নয়। শত শহিদের রক্তে গড়া আজাদীর রক্ততিলক-লাঞ্ছিত প্রভাত-সূর্যের বন্দনা গায় বন্দীরা। ধানের শিষ হেসে উঠবে মাথা তুলিয়ে। কাপাস হাওয়ায় অঞ্জলি দেবে। গানের সুরে ভরে উঠবে ভুবন। আলোর বুকে সেদিন স্নান করবে বসুন্ধরা।

শর্বরীর গর্ভ চিরে নোতুন দিনের ভ্রূণ জন্ম নিচ্ছে। অস্তাচলে নিদ্রিত অরুণের ঘুমের কুয়াশা টুটেছে। দূর আকাশের কোণে দেখা দিয়েছে বহু রাত্রির প্রতীক্ষ্যমাণ তিমিরাংশু। হে বিহংগ, এখনি তোমার পাখা বন্ধ করো না।

—শেষ—